জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ৩২ ।। জ্ঞানগঞ্জ আলাপ পুথি ৪

উপনিবেশ বিরোধী চর্চা - কি করতে হইবে (না)

‘কথামৃত’ আনকাট এবং...

আদিদেব। অত্রি। তীর্থরাজ

জ্ঞানগঞ্জ

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

‘কথামৃত’ আনকাট এবং...
Kothamrrito Uncut Ebong...

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী, কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৮-এর পক্ষে ‘কথামৃত’ আনকাট এবং... প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

জ্ঞানগঞ্জের প্রতিটি প্রকাশনা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য https://gyangonjo.org/

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৮০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

সমাধিষ্টের বহুত্বঃ প্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ ‘কথামৃত’
অত্রি ভট্টাচার্য

‘ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে, তবে জেনো, ‘বিদ্যার আমি’ ‘ভক্তির আমি’ ‘দাস আমি’। সে ‘অবিদ্যার আমি’ নয়।’

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ‘কথামৃত’ (The Gospel of Sri Ramakrishna), যা ‘শ্রীম’ (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) কর্তৃক লিপিবদ্ধ, একখানি সাধারণ ধর্মীয় গ্রন্থ বা জীবনচরিত মাত্র নহে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর এক জটিল ও বহুমুখী দলিলস্বরূপ, যাহা এক গভীর সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক সন্ধিক্ষণের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মার্ক্সবাদ, আনার্কিজম ও উপনিবেশ-বিরোধী তত্ত্বের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ইহাকে পাঠ করিলে ইহার মধ্যে আদর্শগত সংঘাত, কর্তৃত্ব-বিরোধী সম্ভাবনা ও সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধারের এক ক্ষেত্র প্রকাশ পায়। ঐতিহাসিক অমিয় পি. সেন এবং সুমিত সরকারের মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি এবং অ্যাফেক্ট থিওরির ধারণাগুলিকে অবলম্বন করিয়া বলিতে পারি যে, ‘কথামৃত’ এক প্রাক্-ঔপনিবেশিক পরিবেশনামূলক পরিমণ্ডলের পুনরুদ্ধার সাধন এবং পাঠ্যবহুলতা ও আবেগিক আধিক্যের কৌশলী ব্যবহারের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ-ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। ভুয়া মার্ক্সবাদী পাঠ হইল, ধর্ম জনগণের আফিমস্বরূপ, এবং ইহা শাসক শ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখিবার এক হাতিয়ার। কিন্তু ‘কথামৃত’ এই সরল সূত্রকে জটিল করিয়া তোলে। অমিয় পি. সেন তাঁহার ‘শ্রীরামকৃষ্ণ অ্যান্ড দ্য মেকিং অব মডার্ন ইণ্ডিয়া’ গ্রন্থে এই দ্ব্যর্থতারই বিবরণ দিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদিও রামকৃষ্ণের শিক্ষা তত্ত্বগতভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাস অতিক্রম করিত, তথাপি তাহার শ্রোতামণ্ডলী প্রধানত কলিকাতার ভদ্রলোক-শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও প্রায়শই জমিজমার মালিক-শ্রেণী হইতেই গঠিত ছিল। ‘কথামৃতে’র কথোপকথনগুলি যুগলমোহন মিত্র প্রমুখ ভক্তের বৈঠকখানায় সংঘটিত হয়, যাহা এই গ্রন্থকে এক বিশেষ শ্রেণী-কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে। শ্রী সেন রামকৃষ্ণের শ্রোতামণ্ডলীর social composition-র বিবরণ দিয়াছেন, যাহাতে ‘উচ্চবর্ণীয় হিন্দু,

professional মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্য absentee landlord’-দের প্রাচুর্যের উল্লেখ রহিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের ‘ভাত-তরকারী’ আধ্যাত্মিকতার প্রতি রামকৃষ্ণের সমালোচনা এবং কৃষক ও ভৃত্যের জীবন হইতে গৃহীত উপমাগুলি উদীয়মান বুর্জোয়া ধর্মীয় সংবেদনশীলতার প্রতি এক সূক্ষ্ম চ্যালেঞ্জরূপে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু, সেন ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইহা কখনও সামাজিক বিপ্লবের আহ্বান ছিল না। রমণী ও শূদ্রদিগের বিষয়ে তাঁহার বক্তব্যে অনেকস্থলে এক রক্ষণশীলতা বিদ্যমান ছিল। শ্রীসেন রমণীদিগের বিষয়ে রামকৃষ্ণের প্রায়শ দ্ব্যর্থতাপূর্ণ বক্তব্য আলোচনা করিয়াছেন, যাহাতে তিনি তাঁহাকে কখনও Divine Mother-র manifestation, কখনও বা spiritual progress-র obstacle বলিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক সাম্যের এই সম্ভাব্য আমূল-পরিবর্তনবাদিতা শেষপর্যন্ত এমন এক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, যাহা ভদ্রলোক শ্রেণীর - যাহার নিকট হইতে এই আন্দোলনের উদ্ভব - তাহার ভৌত ভিত্তিকে হুমকির সম্মুখীন করে নাই।

সুমিত সরকার তাঁহার ‘রাইটিং সোশ্যাল হিস্ট্রি’ গ্রন্থে রামকৃষ্ণ-ঘটনাটিকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ব্যাপক সংকটের প্রেক্ষিতে স্থাপন করিয়াছেন। সরকারের মতে, রামকৃষ্ণের দিকে ভদ্রবিত্তীয় ঝোঁক আদতে বাংলার একাংশ এলিটের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ও সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতায় হতাশ হইয়া ‘রাজনীতি হইতে পশ্চাদপসরণ’-এর কাল সূচিত করিয়াছিল। শ্রী সরকার এই context-এ ‘the Kathamrita as a document of a retreat from the political’ phrase-টি coin করিয়াছেন। ইহা ছিল পাশ্চাত্যের স্পর্শরহিত এক ‘খাঁটি’ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের সন্ধান। তথাপি, এই পশ্চাদপসরণই নিজেই এক রাজনৈতিক কার্য ছিল - ঔপনিবেশিক যুক্তিবাদ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আধিপত্যবাদী দাবির বিরুদ্ধে এক প্রকার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। এই পাঠানুসারে, ‘কথামৃত’ এক শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বের textual product, যে শ্রেণীটি তাহার বিচ্ছিন্নতা মীমাংসা করিতেছে, এক বিকল্প আধ্যাত্মিক বাস্তবতা নির্মাণ করিতেছে, যাহা সেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতাকেই অন্তর্ঘাতীভাবে সমালোচনা করে, যাহা এই শ্রেণীটিরই সৃষ্টি করিয়াছিল। আনার্কিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী, যাহা সকল প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের

প্রতি স্বভাবতই সন্দিহান, ‘কথামৃতে’র মধ্যে আধ্যাত্মিক অনার্কিজমের এক শক্তিশালী ধারার সন্ধান দেয়। রামকৃষ্ণের মূল শিক্ষা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠান-বিরোধী। তিনি ধর্মের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা - শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য, পুরোহিততন্ত্র ও রীতিনীতির প্রতি আসক্তিকে বারবার অগ্রাহ্য করিয়া Divine-এর সঙ্গে নিজের ecstatic এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ উপমা, ‘পায়ের কাঁটা - কাঁটা দিয়া তুলিতে হয়, তারপর দুই কাঁটাকেই ফেলিয়া দিতে হয়,’ আধ্যাত্মিক পথের প্রাতিষ্ঠানিকরণের বিরুদ্ধে এক আমূল নির্দেশ। তিনি গৃহী সাধক ও পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করিয়াছেন, একটি এমন discourse সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা organised knowledge-র উপর raw, unmediated passion (ভাব)-কে মহিমান্বিত করে। ইহা প্রচলিত হিন্দু ও আধুনিক ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব উভয়ের জন্যই এক গভীর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। অপিচ, সরকার বাহাদুর অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তাও দিয়াছেন - এই অন্তর্নিহিত কর্তৃত্ব-বিরোধিতা ক্ষণস্থায়ী। তাঁহার যুক্তি the Ramakrishna movement, স্বামী বিবেকানন্দ এর mission-এর দ্বারা যাহা systemize ও institutionalise হয়, তাহা অন্তে ‘এক structured, militant ও masculinised Hinduism-রূপে আবির্ভূত হয়। শ্রীসরকার, রামকৃষ্ণের playful, androgynous persona-র সঙ্গে বিবেকানন্দের message-র ‘militant, masculinised’ reframing-র contrast টানিয়াছেন। সুতরাং, ‘কথামৃতে’ নিহিত আনার্কিস্ট সম্ভাবনাকে শেষ পরিণামে এক, শক্তিশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে co-opt করা হয়, যাহা রামকৃষ্ণের anti-structural ecstasy-কে এক structured edifice-তে পরিণত করে। একটি উপনিবেশ-বিরোধী পাঠ ‘কথামৃতে’র সর্বাপেক্ষা significant শক্তির সন্ধান পায় ঔপনিবেশিক-পূর্ব বাঙ্গালার এক পরিবেশনামূলক জগতের textual পুনরুদ্ধারের মধ্যে। এই গ্রন্থখানি দার্শনিক treatise নহে, বরং performance-এর বিবরণ - যাহাতে conversation, song, physical gesture এবং ecstatic state-এর বর্ণনা রহিয়াছে। অমিয় সেন রামকৃষ্ণের idiom-কে সরাসরি বাংলার vernacular, syncretic traditions—বাউলের গূঢ় জ্ঞান, সহজিয়া ভক্ত-র ecstatic কীর্তনের সঙ্গেও যুক্ত করিয়াছেন। এই traditions

এমন এক domain-এতে বাস করিত, যাহা প্রধানত oral, corporeal এবং community-based ছিল, যাহা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার text-centric, reason-based discourse-এর সহিত স্পষ্ট বৈসাদৃশ্য রাখিত।

‘কথামৃত’ পাঠ্যবহুলতা (textual excess)-তে পরিপূর্ণ। ইহা repetition, digression-এ পরিপূর্ণ, যাহা এক linear, rational reading-কে challenge করে। এই আধিক্য কোনও ত্রুটি নহে, ইহাই ইহার central feature, ইহা প্রাক্-ঔপনিবেশিক পরিবেশনামূলক tradition-এর unstructured, spontaneous flow-কে প্রতিফলিত করে। যাহা colonial rationality-কে marginalise করিয়াছিল, তাহারই এক বিকল্প epistemology-র সন্ধান। text-এ এই পরিবেশনামূলক আধিক্যকে embody করিয়া, ‘কথামৃত’ এক উপনিবেশ-বিরোধী space সৃষ্টি করে, যেখানে এক subaltern mode of being and knowing সংরক্ষিত ও মহিমান্বিত হয়।

Affect Theory, যাহা body-গুলির মধ্যে circulating pre-personal, embodied intensity-র study করে, তাহা ‘কথামৃতে’র social impact-কে comprehend করিবার একটি শক্তিশালী framework প্রদান করে। এই গ্রন্থ কেবল event-র report নহে, ইহা affective transmission-র transcript, রামকৃষ্ণের নিজের body-ই এই intensity-র primary site—তিনি frequently সমাধিতে চলিয়া যান, uncontrollably কাঁদেন, ecstasy-তে নৃত্য করেন, divine love-এ কাঁপেন। ইহা কেবল personal experience নহে, ইহা contagious affective event, তাঁহার চারিপাশে সমবেত ভক্তগণ-যুক্তিবাদী, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ভদ্রলোক-সহ —repeatedly এই affective field-এ মোহিত হন। তাঁহারা তাঁহার presence-তে peace, joy, fear or overwhelming love feel করিবার report দিয়াছেন। ‘কথামৃতে’র পাঠ্যবহুলতা (textual excess) প্রকৃতপক্ষে এই ভাবাবেগের আধিক্যেরই record, ভক্তি-র affect এক political force হইয়া দাঁড়ায়, organised protest-এর মাধ্যমে নহে, কিন্তু shared, intense feeling-র দ্বারা bound community create

করিয়া, যাহা colonial subjectivity-র normative bound-এর প্রান্তে অবস্থিত। ‘কথামৃত’ এক প্রাক্-ঔপনিবেশিক পরিবেশনামূলক জগতের vital archive, যাহার textual affective excess, colonial rationality-র very foundation-কেই challenge করিয়াছিল। dogmatic pronouncement-এর মাধ্যমে নহে, কিন্তু এক বিকল্প being-এর contagious, ecstatic performance-এর মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীম রচিত ‘কথামৃতে’ ধৃত, তাঁহার সর্বাধিক স্থায়ী সূক্ষ্ম প্রতিরোধ stage করিয়াছিলেন।

‘কথামৃত’ আনকাট এবং...

আদিদেব। অত্রি। তীর্থরাজ।

রাত্রি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

আদিদেব। এর আগেও কথাটা বলেছিলাম, একটু মজার ছলেই অবশ্য; যদি আমায় কেউ একটা নির্জন দ্বীপে পাঠিয়ে দেয় আর একটা মাত্র বাংলা বই বেছে নিতে বলে, তাহলে আমি ‘কথামৃত’-ই বেছে নেব। আমি ভক্ত নই, বস্তুত অধার্মিক এবং আমার নরকেও স্থান হবে না। কিন্তু আমার যাপনের কারণে, আমি যেহেতু রামকৃষ্ণ আশ্রমে পড়েছি, আমার পরিবারও রামকৃষ্ণাশ্রিত, বাল্যেই ‘কথামৃত’ বইটি আমার হাতে চলে এসেছিল।

বইটির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতা হয় যখন আমি একটা সঙ্ঘে যাতায়াত শুরু করি, ওখানে প্রতি রোববারে সেটা পাঠ করা হত। সেই পাঠ শুনেশুনে, আর বাড়িতে পড়েও, ব্যাপারটা রপ্ত হয়ে গেছিল বলা যায়। ফাইভ-সিক্সের কথা বলছি। সেই সময় মাথায় ঢুকে গিয়েছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে জানতে হবে, পড়তে হবে... ইত্যাদি ইত্যাদি। বয়েস বাড়লে ঘোরতর নাস্তিক হওয়ার পরেও ‘কথামৃত’ আমার জীবনে একটা খুব জরুরি বই হিসেবে থেকে যায়।

এর ইংরেজি সংস্করণের নাম ‘গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ’। যেন একটা বিবলিক্যাল টাচ। খ্রিস্টের অনুমোদিত গসপেল (যা ‘কিংস জেমস বাইবেল’-এ রয়েছে) লিখেছেন ম্যাথু, মার্ক, লুক আর জন। ম্যাথুর কথাই ধরি। ম্যাথু লিখছেন যিশুর জীবনী, যিশুর মর্ত্যলীলা ও উপদেশের বিবরণ।

অত্রি। বাংলায় ‘মথি লিখিত সুসমাচার’ হয়ে যাচ্ছে...

আদিদেব। হ্যাঁ। মথি ছিলেন করগ্রাহী, ট্যাক্স কালেক্টর। যিশু তাঁকে বললেন, আমার সঙ্গে এসো। ম্যাথু তাঁকে অনুসরণ করলেন। এভাবে

পিতর, জুডা সকলেই যিশুকে অনুসরণ করলেন। মথি নিজেকে চরিত্র হিসেবে দেখাচ্ছেন। ...মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কিন্তু আত্মনেপদীতে লেখেন নি, তিনি 'মাস্টার', 'মণি', 'ম' এইসব নামে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। ('কথামৃত'-এ যদিও রামকৃষ্ণের বিস্তারিত জীবন নেই, সুসমাচারটুকু আছে।)

যিশু কী করছেন? এই একটা অলৌকিক কাজ (মিরাকল) করলেন, এই একটা প্যারাবল বললেন। তাঁর প্যারাবলের বহু অংশ আমরা মুখের ভাষায় ব্যবহার করি, যেমন 'রিটার্ন অব দ্য প্রডিগাল সান'। উৎপল দত্ত 'টিনের তলোয়ার'-এ ঠাট্টা ক'রে লিখেছেন, 'একপাল শূকরের সামনে মুকুতা ছড়াইলাম', যা আসলে যিশুর উক্তির রেফারেন্স, 'শূকরের সামনে মুক্তা ছড়িও না।' এরকম অজস্র 'কোটেবল কোটস'।

'কথামৃত'-র একটা চরিত্র হচ্ছে বইটা এনসাইক্লোপিডিক। রামকৃষ্ণ কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন না, লিখতে-পড়তে পারতেন। 'অষ্টাবক্র গীতা' নিজের কাছে রাখতেন। যদিও উনি শুনে শুনে বেশিটা শিখেছেন - যা শেখার একটা সেরা উপায়। রামকৃষ্ণ অনেক গল্প, অনেক উপমা নিয়েছেন যেমন পুরাণ-উপনিষদ থেকে... পাশাপাশি যাকে বলে পল্লী সাহিত্য, সেটা গান হতে পারে, কৌতুক হতে পারে, স্ল্যাং হতে পারে, তা থেকেও অজস্র।

'সিদ্ধ' কাকে বলে? —উত্তরে বলছেন, 'সেদ্ধ' হওয়া বা 'নরম' হওয়া। যিনি সাধনার একটি স্তরে উন্নীত হয়েছেন, পাশাপাশি বিনীত ও আপ্লুত হয়েছেন। ...ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহলে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না কেন? বলছেন, সবাই সবার মুখ দেখতে পাচ্ছে কারণ 'সার্জ্জন সাহেব' (সার্জেন্ট) সবার মুখে আলো ফেলছে - শুধু তার মুখখানি অন্ধকারে ঢাকা। তারই হাতে আলো, তাই সে অপ্রকট। এই সার্জেন্টের মতো ঈশ্বরও আড়াল হয়ে আছেন। এই যে ব্রহ্মাণ্ড, এই যে প্রত্যেকের সাবজেক্টিভ দেখা— চিত্রকল্প দিয়ে তারই

ভাববাদী বিশ্লেষণ। বলছেন, সার্জেন্টের মুখ দেখতে হলে তার কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যদি সে কৃপা ক’রে নিজের মুখে আলো ধরে!

কথা বলতে বলতে প্রায়ই বিভোর হয়ে যাচ্ছেন। ...’আমি মায়ের কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে বলেছিলাম, মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।’... যেন মন্ত্র বলছেন, মুখের কথা গানের মতো বেজে উঠছে।

মাস্টার প্রায়ই এখানে আসেন, রামকৃষ্ণর কথাবার্তা শোনেন, সবটুকু আনকাট জার্নালের মতো লিখে রাখেন। জার্নাল হলেও যেখানে খুব একটা ব্যক্তিগত কথা নেই। এখানে লেখক ডকুমেন্ট করে, সেন্সার করে না। জয় গোস্বামীর ‘কথামৃত’ নামে একটা চমৎকার কবিতা রয়েছে, তার প্রথম চারটে লাইন এরকম, ‘ঠাকুর, রামকৃষ্ণদেব ঝাউতলায় বাহ্যে গেলেন/ রাখাল, মাস্টার, হাজরা মহেন্দ্রাদি শিষ্য কয়জন/ একপ্রকার আছি/ দেখি দূরে মর্মরিত ঝাউবন’। গাড়ু নিয়ে ঠাকুর বাহ্যে যাচ্ছেন, এই বাক্যটা ‘কথামৃত’-তে কত বার আছে, একশো, দুশো? বলতে পারব না। ঠাকুর ‘অশ্লীল’ কথা অনর্গল বলছেন, ন্যাংটা যখন থাকত (ন্যাংটা মানে তোতাপুরী, অদ্বৈতবাদী, রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় গুরু) ধনে হাত দিয়ে ফচকেমি করতুম। কাপড়চোপড় ঠিক থাকছে না, কাপড় বগলে উঠে যাচ্ছে, তখন নিজেকে নিয়েও ঠাট্টা করছেন। এবং মাস্টার সবই লিখছেন, শ্লীল অশ্লীলের বিচার করছেন না। উনি ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, নিশ্চয় তাঁর ওপর ভিক্টোরিয়ান [মরালিটির] প্রভাব পড়ে থাকবে। কিন্তু এ সব কথা যেহেতু রামকৃষ্ণের মুখ থেকে বেরোচ্ছে, তা অমৃতকথা হয়ে যাচ্ছে।

একটা ঘটনা বলি। ত্রৈলঙ্গস্বামী কাশীতে থাকতেন, মৌনী ছিলেন, কথা বলতেন না। একদিন মা কালীর মন্দিরে ঢুকে সটান পেচ্ছাপ করে দেন। এই নিয়ে মন্দিরের পুরুতরা খুব চটে যায়। এটা কী হল? তিনি পেচ্ছাপটা দিয়ে মাটিতে লিখে দিলেন ‘গঙ্গোদকং’। তখন ভক্তেরা বলছে, ঠিকই তো, উনি তো

সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ, ওঁর প্রস্রাব তো গঙ্গার জলই। ত্রৈলঙ্গ প্রকৃতই একসেন্ট্রিক ছিলেন, সিনিকও বলা যায় (প্রাচীন গ্রিক দর্শন 'সিনিসিজম' দ্রষ্টব্য)। এই গঙ্গায় চিতসাঁতার কাটছেন। এই জল থেকে উঠে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কোনো দিকে দৃকপাত করছেন না, দলে দলে মানুষ তাঁকে সাক্ষাৎ শিব ভেবে অনুসরণ করছে। উনি প্রস্রাব করলে সেটা গঙ্গার জল আর রামকৃষ্ণ স্ল্যাং বললে সেটা অমৃতকথা। এর পলিটিক্সটা এইভাবে বুঝতে হবে।

'কথামৃত' বইটা যেমন জার্নাল-ধর্মী, তেমনই আবার নাটকের মতো; শিষ্যরা ঢুকলেন, বসলেন, কথাবার্তা জমে উঠেছে। নরেন্দ্র গান গাইছেন, (নরেন্দ্র অর্থে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরে বিবেকানন্দ), রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে মাথা অল্প অল্প দোলাচ্ছেন। হয়তো রামকৃষ্ণ ভগবৎ বিষয়ে কোনো উক্তি করলেন। সেই উক্তি নিয়ে কেউ একটা ফুট কাটল। তখন সেই নিয়ে তিনি রগড় করলেন, সকলে হো-হো করে হাসল। হয়তো এর পরেই দশটা প্যারাবল রামকৃষ্ণ বলবেন। তারপর সেদিনের মত বৈঠক শেষ হচ্ছে, কারণ রামকৃষ্ণের খিদে পেয়েছে কিংবা ভাবসমাধি হয়েছে। পরের দিন আবার নতুন নাটকের শুরু।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাচ্ছেন, সেয়ানে সেয়ানে কথাবার্তা চলছে। যুক্তির পালটা যুক্তি, যেন ডিসকোর্স। এমন লেখার দৃষ্টান্ত ফরাসিদেশে দেনি দিদরো-র 'রামোর ভাইপো' কিংবা 'অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মনিব' বইতে পাওয়া যায়। মার্কই দ্য সাদ-ও লিখেছেন 'মৃত্যুপথযাত্রী ও পুরুতের সংলাপ।' দোম আন্তোনিয়োর 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ' যেমন। রামমোহনে, বঙ্কিমচন্দ্রেও কথার পিঠে কথা বলে যুক্তি সাজানোর ধরন আছে।

অত্রি। আমি এখানে বিবেকানন্দের কথা বলব। তাঁরও এই রকম শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' বইতে আছে। সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এই দুটো বই-এর আদলের একটা তফাত আছে। তফাতটা হল 'কথামৃত'তে ভক্ত এবং গুরু - তাদের আলাপের মধ্যে একজটা গণতান্ত্রিকতা আছে।

আদিদেব। খুব ভালো পয়েন্ট।

অত্রি। রামকৃষ্ণ আশা করছেন না, সবাই শিষ্য বলে আমার অধঃস্তন হয়ে থাকবে।

আদিদেব। সকলে শিষ্যও নয়। আলাপ করতে অনেকে আসত, তর্ক করতেও।

অত্রি। তাহলে বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এই পাশাটা উলটে যাচ্ছে কী করে? রামকৃষ্ণ আদতে যে সমাজ থেকে আসছেন, সেই বাংলার গ্রাম সমাজের একটা প্রাগআধুনিক অবশেষ আছে রামকৃষ্ণের মধ্যে। কিন্তু বিবেকানন্দ তো নব্য কলকাতার ফসল, ফলে তাঁর ভাষা তো ক্ষমতার ভাষা হবেই। আধুনিক। তার মধ্যে তুমি বারবার যে কথাটা বলছ, তার মধ্যে একটা হোমোইরোটিক অ্যাটিচিউড আছে।

আদিদেব। সবসময়েই।

অত্রি। আমরা বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো জিনিস দেখব। সেখানে ভরপুর পৌরুষ আছে। সেই পৌরুষের রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছে।

আদিদেব। রামকৃষ্ণ নিজেও বলেছেন, নরেন হচ্ছে মদ্দা।

অত্রি। আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। বঙ্কিমের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে, তিনি বঙ্কিমকে কিন্তু পাটোয়ারি বুদ্ধি বলছেন।

আদিদেব। অপূর্ব! বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করছেন, বলো তো কর্তব্য কী? বঙ্কিম উত্তর দিচ্ছেন, এ আর কি, আহার নিদ্রা মৈথুন। উনি বলছেন, আঃ, তুমি বড় ছ্যাঁচড়া। মুখের ওপর বঙ্কিমকে এই একজনই ছ্যাঁচড়া বলতে পারেন! বলছেন, যে মুলো খায় সে মুলোর ঢেঁকুর তোলে; তুমি সারাদিন যা কর, সেই কথাই তো বলবে। বঙ্কিম হয়তো ভাবছেন, কোথায় এলাম! যেমন বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের সঙ্গে ঠাট্টা করে কথা বলছেন। রামকৃষ্ণ শুরুতেই হাসিয়ে দেন, এতদিন ডোবা দেখেছি, বিল দেখেছি, পুকুর দেখেছি, এবার সাগর দেখলাম। বিদ্যাসাগর পালটা মশকরা করছেন, তাহলে খানিকটা নোনাজল নিয়ে যান। রামকৃষ্ণ বলছেন, নোনাজল কী গো, তুমি তো ক্ষীরসমুদ্র! ...প্রম্পটলি উত্তর দিচ্ছেন, কেউ টিকতে পারবে না, জিভের ধার এতখানি। উনি কিন্তু আরবান, শুধু গ্রামের প্রতিনিধি নন। কলকাতারও বটে।

অত্রি। আরবানিটি অনেকটা হারবার্ট সরকারের মতো (নবারুণ ভট্টাচার্যের প্রথম উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র)। পাঁচালি শুনে বড় হয়েছেন, আবার যে শহরটা তৈরি হচ্ছে তাও দেখছেন। প্রথম যুগের প্রসেনিয়ামও দেখছেন, গিরিশ ঘোষকে দেখছেন। এখন আমরা বলি পারফরম্যাটিভ পলিটিক্সের কথা, গান্ধী কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে যে পারফরম্যান্স করছেন, সেটা ভেবে করেননি, জনপরিসরে থাকার জন্য নিজের শরীরকে ব্যবহার করছেন। তুমি কি রামকৃষ্ণকে পারফরমার হিসেবে দেখো?

আদিদেব। বটেই তো। আঙুলের নানা মুদ্রা করছেন (আমরা যুক্তিবাদী চোখ দিয়ে বুঝতে পারি, এটা এপিলেপ্সি ছিল) সেই অবস্থায় হাতটা শক্ত হয়ে গেল। প্রায়ই গান গাইতেন, গানের ভালো গলা ছিল। 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে', এমন অজস্র। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে রামকৃষ্ণ-সঙ্গীতের একটা ধারা তৈরি হচ্ছে। বিবেকানন্দও বেশ কিছু গান লিখবেন, সুরও করবেন (যার মধ্যে 'খণ্ডন ভববন্ধন' সবচেয়ে প্রচারিত, মিশনের অ্যান্থেমও বটে)। রামকৃষ্ণকে একবার ছবি আঁকতে দেওয়া হয়েছিল, উনি আঁকলেন একজন বেশ্যা হুঁকো খাচ্ছে। ঠনঠনের কালীবাড়ি দেখছেন, সর্বমঙ্গলা মন্দির দেখছেন, কোথাও দেখলেন বেশ্যারা বসে আছে, 'মা তুই এখানে এই হয়েছিস' ব'লে প্রণাম করছেন। সচরাচর মানুষে ভেদ করতেন না, বলতেন সাধুরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ, সবরকম নারায়ণ আছেন। কামনা-বাসনা নিয়ে অদ্ভুত উপমা দিচ্ছেন। একটা বুড়ি বেশ্যা, সে পিছন ফিরে পড়্‌পড়্ করে হাগছে। এক বৃদ্ধ গণিকার ইমেজ দিচ্ছেন, তার সঙ্গে সাউন্ডও। যেন ফিল্ম হচ্ছে। তারপরেই হয়তো মহাভারত থেকে কোনো প্যারাবল বলবেন। সেই ডেমোক্রাসি তাঁর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও আছে। কোনো আড় নেই। তেমনই উপস্থিত বুদ্ধি। কেউ হয়তো দেখা করতে এসেছে, তাকে দেখেই রামকৃষ্ণ বুঝে গেছেন, একে দিয়ে হবে না। বললেন, যাও বিল্ডিং (মন্দির) দেখো গে। তারপর অন্যদের বলছেন, দেখলে কেমন কাটিয়ে দিলাম!

অত্রি। অনেক ঐতিহাসিক ক্লেম করেছেন, বিবেকানন্দ আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। অনেকেই বিবেকানন্দ-অনুপ্রাণিত, যেমন সুভাষ বসু। যেমনটা সুমিত সরকার বলছেন, বামপন্থী ঐতিহাসিকরা বলছেন। তার

আগে বলে নিই, আমি রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দকে আলাদা কর্তাসত্তা (এজেন্সি) হিসেবে দেখি। এঁরা দুজনে দুটো আলাদা সময়ের, আলাদা ভাবধারার মানুষ।

আদিদেব। আলাদা এজেন্ডার মানুষ।

অত্রি। এই যে দুটো আলাদা মানুষকে অনেকদিন অনেকেই এক করে দেখিয়েছেন।

আদিদেব। সেটা মিশনও দেখিয়েছে, তাতে তাদের সুবিধেও হয়েছে।

অত্রি। একদম। এই যে বলা হচ্ছে ছেলেদের ভগবৎ চিন্তায় মজিয়ে দিয়ে বিপ্লবী চিন্তা থেকে সরিয়ে আনছে... রামকৃষ্ণের সময়ে না হলেও, বিবেকানন্দের মধ্যে দিয়ে কোনো এক রামকৃষ্ণ বহমান।

আদিদেব। কিন্তু বিবেকানন্দের কথায় তো বিপ্লবীরা তো উদবুদ্ধ হত। বিখ্যাত উক্তি, গীতা পাঠের বদলে ফুটবল খেললে স্বর্গের আরো নিকটবর্তী হবে। ব্রহ্মচর্য, শরীরচর্চা ইত্যাদি ব্যাপারে...

অত্রি। কিন্তু সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষ এটা নিয়ে আপত্তি করছেন। ওঁর এই নিয়ে লেখা আছে। উনি বলছেন, কোথাও একটা বিচ্যুতি ঘটে যাচ্ছে। তারা সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তায় নিয়োজিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেখানে ডিসক্লেমার হিসেবে ধর্ম আসছে। আমি এখন মনে করি এটা আধুনিকতার অসুখ, ধর্ম দেখামাত্রই শিউরে ওঠা। কিন্তু এই ডিস্ট্যান্সটা হল কেন? একে কীভাবে দেখ? কোন ভাবনার সঙ্গে কোন ভাবনার সংঘাত থেকে এটা ঘটছে? নাকি আমরা দুজনকে আলাদাভাবে বুঝিনি বলে ঘটছে?

আদিদেব। আমরাই যে বুঝিনি, সেটাই মূল কথা। আমাদের ভুল বোঝানো হয়েছে। রামকৃষ্ণ যদিও বলেছেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা, উনি কিন্তু জগতকে পালটানো নিয়ে আদৌ ইন্টারেস্টেড ছিলেন না। বিবেকানন্দ যে মিশন তৈরি করেছেন, সেটা আদতে খ্রিষ্টিয় মডেল। সঙ্ঘ করব, ইউনিভার্সিটি করব, তার প্রভাব ৪০০০ বছর পরেও বোঝা যাবে... এ সব আইডিয়া রামকৃষ্ণের মোটে ছিল না। রামকৃষ্ণের মধ্যে একটা মৌলিক ইনডিফারেন্স ছিল। একটা

গল্প বললেই বোঝা যাবে। একজন এসেছে রামকৃষ্ণের কাছে। রাস্তায় টাকা পড়েছিল, সেটা এক ভিখারিকে দিয়েছে, ঘটনাটা রামকৃষ্ণকে বলছে। রামকৃষ্ণ বললেন, দিলি কেন? তোর এতে কী এসে যায়? জগতের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা এইসব নিয়ে তাঁর কনসার্ন ছিল না। সবকিছুকেই উনি ঈশ্বরের লীলা বলে ধরেন। ঈশ্বরের নৈতিকতা আলাদা, যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টে ইয়োবকে বলা হয়েছে, তিনি ভালো-মন্দের উর্ধ্বে। ঈশ্বর যা করেন, তা আমাদের বিচারের বাইরে। যদি এখানে ভূমিকম্প হয়, দাঙ্গা লাগে বা মহামারী হয়, তাতেও তাঁর মহিমার কিছু খামতি হয় না।

অত্রি। গান্ধীও বলেছিলেন, (গুজরাতের ভূমিকম্প) পাপের ফল।

আদিদেব। বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের সঙ্গে রামকৃষ্ণের জীবনদর্শনের কতখানি মিল? রামকৃষ্ণ মনে করতেন, মানুষের মহত্তম উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। এমন কি সংসার করেও কিন্তু ঈশ্বরদর্শন করতে পার; যেমন কুলটা উপপতিকে ভজনা করে। তুমি প্রকাশ্যে সংসারে নিষিক্ত, কিন্তু ভাবছ ঈশ্বরের কথা। কিন্তু সামাজিক অবিচার নিয়ে কতটা ভেবেছিলেন তিনি? হ্যাঁ, সামনে অবিচারের ঘটনা ঘটলে কি তিনি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না? তিনি যথেষ্ট কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। এমন লেজেন্ড আছে, নৌকোর মধ্যে কেউ কাউকে মারছে, রামকৃষ্ণের দেহ লাল হয়ে গেল। কিন্তু এ তাঁর ভাবনার মূলবিন্দু নয়।

ইন্টেলেকচুয়ালি তিনি অন্য কিছু ভাবতেন। ফিলোজফি যদি তাঁর কিছু থেকে থাকে, তবে তা এইরকম, (শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে যেমন) ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা। এটা উনি সার বুঝেছেন। তিনি তো অদ্বৈত বেদান্তের পাঠও নিয়েছেন। তন্ত্র সাধনা থেকে অদ্বৈত সাধনা করেছেন, কিছু দিন খ্রিশ্চান মতে আচরণ করছেন, কিছু দিন তিনি ইসলামি মতে আচরণ করছেন, তাঁর বৈষ্ণব ভাবও হচ্ছে, রাধিকাভাব হচ্ছে। উনি ধর্ম নিয়ে শেষ দেখে ছাড়ছেন। কালীর খাঁড়া দিয়ে তিনি গলা কাটতে গিয়েছিলেন, দেখা না দিলে প্রাণ দিয়ে দেব। এটাই রামকৃষ্ণ। একে যদি ধর্ম উন্মাদনা বলা যায়, তবে ধর্ম উন্মাদনা; একে যদি ইউফোরিয়া বলা যায়, তবে ইউফোরিয়া। মূল কথাটা হল, দেখা তোমায় দিতেই হবে। উনি ভগবানের দেখা চেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখাও

পেয়েছেন। তিনি যেন অরূপের সাগরে ভেসে যাচ্ছেন, দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি হচ্ছে।

এই কথা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিদেশে গিয়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েডকে বলেছিলেন, একজন ভারতীয় সাধুর মিস্টিক অনুভূতির কথা। ‘ওশানিক ফিলিং’, এই নাম দিয়ে ফ্রয়েড একটা বই শুরু করেন, ‘সিভিলাইজেশন এন্ড ইটস ডিসকন্টেন্টস’। বইতে তিনি বলছেন, অনেকেই এই ‘ওশানিক ফিলিং’-এর কথা বলেছেন; কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি না। কী ক’রে একজন মানুষের মনে আধ্যাত্মিক সাগরে ভেসে যাওয়ার অনুভূতি তৈরি হয়? যদি সেই অনুভূতি হয়ও, তাহলে তাকে নিউরোসিস বলেই জানতে হবে। আলাপের শেষে সুনীতিকুমারের উপলব্ধি, ফ্রয়েড আদতে কর্মযোগী। এবং সত্যিই ফ্রয়েড পুরোপুরি স্কেপটিক ছিলেন। কিন্তু আমরা যারা স্কেপটিক নই, একটু আধটু সাহিত্য করি - একটু মিস্টিক আছি- বোধহয় সাহিত্য করলে লোকে অল্প মিস্টিক হয়ে যায়। এটা একটা দোষই (যে জন্য বিপ্লবীরা সর্বদা লেখকদের ভাল চোখে দেখেন না)। আমরা এই ‘ওশানিক ফিলিং’ বুঝতেও পারি, আবার নাও বুঝতে পারি।

কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। রামকৃষ্ণ ভাবতেন, আমি জন্মেছি - ঈশ্বরকে না দেখে মরে যাব? কীটজন্ম, কুকুরজন্ম পেরিয়ে আমরা সুকৃতির ফলে মানবজন্ম লাভ করেছি। এই জন্মে আমি ঈশ্বরকে না দেখে, না রিয়েলাইজ করে মারা যেতে পারি না! হয়তো বা সমস্ত প্রাচীন ফিলোজফির শেষ কথা, নো দি অ্যাবসোলিউট, নো দাইসেলফ। নিজেকে জানো, পরম সত্যকে জানো। আধুনিক ফিলোজফি এই ধারণাটা বাতিল করে দেয়, কারণ ‘পরম’ নিয়ে সে ভাবিত নয় আর ‘আত্ম’ তার কাছে একটা পলিটিকাল নির্মাণ।

অ্যাবসোলিউটকেই রামকৃষ্ণ ঈশ্বর বলছেন। কিন্তু একে তো আমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানার্জনও বলতে পারি। কঠোপনিষদে দেখছি নচিকেতা যমের কাছে যাচ্ছেন, বলছেন, আমি মৃত্যুর রহস্য জানতে চাই। যম বলছেন, কী হবে এ সব জেনে? তুমি অপ্সরাদের উপভোগ কর, এ সব জানতে চেয়ো না। নচিকেতা বলছেন, আমার এসব চাই না, আমি ব্রহ্মজ্ঞান নিয়েই ফিরব। যম বলছেন,

তোমার আকুলতা দেখে আমি আশ্চর্য, আমি তোমায় জানাব। যম আত্মা-র রহস্য ব্যাখ্যা করছেন, যা খুবই ভাল লাগে পড়তে, যা খুবই কাব্যিক, কিন্তু কিছু বোঝা যায় বলে আমার তো মনে হয় নি। অন্তত আমি বুঝিনি।

রামকৃষ্ণের মূল এজেন্ডা ঈশ্বর দর্শন। খাঁটি মিস্টিকের এটাই তো চাওয়া। খাঁটি মিস্টিকের উদ্দেশ্য কি পৃথিবী পরিবর্তন? মোটেই না। কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে অন্য ব্যাপার ছিল। বিবেকানন্দ ইন্টেলেকচুয়াল। তিনি রামকৃষ্ণর থেকে ঋণী, প্রতিকূল সময়ে জীবনের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। বিবেকানন্দ যখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তখন কান্ট, মিল, কোঁত ইত্যাদি পড়েটড়ে স্কেপটিক হয়েছিলেন। তাঁর নাস্তিক-ওরিয়েন্টেশন এখন মিথে পরিণত হয়েছে।

অত্রি। তিনি হার্বার্ট স্পেনসারকে চিঠি লিখছেন... ভাবা যায়?

আদিদেব। ...তিনি রামকৃষ্ণকে খুঁটি করেছেন। কিন্তু তাঁর এজেন্ডা ভিন্ন। তিনি গুরুর একটা কথা যদিও সর্বদা মান্য করেছেন। রামকৃষ্ণ বলেছেন, তোকে এদের আশ্রয় দিতে হবে, তুই বটগাছের মতো আশ্রয় হবি। মনে রাখতে হবে, রামকৃষ্ণ কিন্তু বিবেকানন্দকে মিশন তৈরির কথা বলে যান নি। সেখানে বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য কী? এমন কিচেন তৈরি করতে হবে যেখানে ভাতের ফ্যান নর্দমায় পড়ে নর্দমার জল সাদা হয়ে যায়। বিবেকানন্দ যে রিয়েলিটি দেখেছেন রামকৃষ্ণ সেটা দেখেন নি। সারা ভারতের দারিদ্র্য দেখে সেই কষ্ট বিবেকানন্দের প্রাণে এসে লাগছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, এই বাস্তবকে বদলাতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর স্ববিরোধ। একদিকে ধর্ম। তিনি রামকৃষ্ণের কমিটেড শিষ্য। নিজেও ওশানিক ফিলিং-এর সম্মুখীন হয়েছেন। কালীর কাছে গেছেন আর জ্ঞান দাও-বৈরাগ্য দাও ব’লে ফিরে এসেছেন। আবার নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলছেন। যিনি এই কথা বলছেন, তিনি মার্ক্স পড়েননি, হতেই পারে না। তখন কার্ল মার্ক্স প্রয়াত।

অত্রি। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় আছে তাঁর সঙ্গে পিটার ক্রপোটকিন-এর দেখা হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ‘সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ’ বইটা নতুন করে অনুষ্টুপ প্রকাশ করেছে। ইংরেজিটাও করেছে, বাংলাও অনুবাদ করিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজিটাই পড়া উচিত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বহুকাল ধ’রে

এই চেষ্টা করেছেন। বাংলার বামপন্থীরা এটাকে ভালভাবে নেননি বলেই এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি।

আমি অন্য একটা কথা বলব। তোমার-আমার দুজনেরই প্রিয় মানুষ সুব্রত সেন। ওঁর একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম। সেখানে ‘কথামৃত’ নিয়ে বেশ খানিকটা কথা বলেছি। পুরোটা বলছি না, ওঁর একটা পয়েন্ট অব প্রোপোজিশন ছিল, ‘কথামৃত’ যতটা না রামকৃষ্ণ-এর, তার থেকে অনেক বেশি শ্রীম-এর। লেখকের ঐশীগুণে সৃষ্ট একটা টেক্সট। এটা নিয়ে তোমার অবস্থান জানতে চাই। আরো একটা কথা, আমি কোট করছি, ‘বাংলা ভাষায় এরকম অতিলৌকিক গ্রন্থ বড়জোর তিন কি চারটি। এবং যার অতিলৌকিকত্বের ব্যাখ্যায় বসলে ফ্লব্যের... (থেকে) উত্তর আধুনিক তত্ত্বে পৌঁছতে হবে। তখনই আমরা ‘কথামৃত’ সম্পর্কিত আধা-ধার্মিক ভাব বিহ্বলতা কাটিয়ে ‘কথামৃত’কে টেক্সট হিসেবে দেখতে পাব - তার অনন্য সাধারণতা সমেত।’ এ বিষয়েও কিছু বলো।

আদিদেব। শেষের কথাগুলো যে খুব বুঝেছি এমন নয়, মোটামুটি আন্দাজ করছি। তবে ‘কথামৃত’তে প্রচুর সাংস্কৃতিক প্রক্ষেপ ইত্যাদি রয়েছে, যা উত্তর আধুনিক চিন্তকদের খুব প্রিয় হতে পারে। ফ্লব্যের অনেক পুরোনো। বহু সামাজিক বিষয়কে নিয়ে তিনি ব্যাপক ঠাট্টা করেছেন। ফ্লব্যের-এর একটা লেখা আছে, একটা কল্পিত অভিধান, ‘ডিকশনারি অব দ্য অ্যাকসেপ্টেড আইডিয়াজ’, যেটা ‘বুভের ও পেকুশে’ উপন্যাসের শেষে রাখা হয়েছে। পরে আলাদা ক’রে বই হিসেবে বেরোয়। একটা উদাহরণ দিই। ‘পি ফর প্যারিস, যে শহর কিনা ভদ্রমহিলাদের জন্য স্বর্গ, ঘোড়াদের জন্য দুঃস্বপ্ন।’ এখান থেকে ফ্রান্সের একটা অন্য ইতিহাস বেরিয়ে আসে। একই কথা ‘কথামৃত’ সম্বন্ধে বলা যায়। ‘কথামৃত’ আমাদের ফ্যাসিনেট করেছে কারণ এটা ভীষণ লাইভলি। এই লাইভলি চরিত্র ধরে রাখতে শ্রীম-র একটা বিশেষ ভূমিকা তো আছেই। যে ভাষায় উনি লিখছেন সেটাই আদতে এই চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। শ্রীম নিজেকে চাপিয়ে দিচ্ছেন না, বরাবর প্যাসিভ থাকছেন আর লেখায় লাইভলিনেস রেখে দিচ্ছেন। রামকৃষ্ণ তো কথা বলেছেন, কিন্তু সেটাকে লেখায় ধরতে হচ্ছে। সেই ধরাটা একিউরেট। শ্রীম-র স্মৃতি

চমৎকার। এবং কোনো ইনহিবিশন ছাড়াই লিখছেন। এই বইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় বিপিনবিহারী গুপ্তর ‘পুরাতন প্রসঙ্গ’-এর।

কথকের বক্তব্য বা আইডিওলজি নিয়ে প্রশ্ন করতে পারো; বলতে পারো এটা ঠিক না, ওটা ঠিক। পড়তে গিয়ে বোর লাগবে না। গোটা বইটা যেন একটা কার্নিভ্যাল। এই বইতে শুধু রামকৃষ্ণ নেই - আরো অনেকে আছেন, তাঁরা অনেকেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, যিনি ঘোর যুক্তিবাদী, তিনি রামকৃষ্ণের সামনে এসে বসছেন আর রামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, একটু বিশ্বাস হল, একটু বিশ্বাস হল? মহেন্দ্রলাল বলছেন, ওরকম হয় না, আমি তোমার কাছে আসি তোমায় ভালবাসি ব’লে। সাধারণত তিনি আবেগপ্রবণ হতেন না, বরং ধমক-ধামক দিতেন, তোমরা এই লোকটার মাথা খাচ্ছ, এত ভালো লোকটাকে তোমরা অবতার বানাচ্ছ; পুজো-টুজো করছ, কেন করছ? উনি খুব রাগ করতেন। রামকৃষ্ণ রাগতেন না, হাসতেন। মহেন্দ্রলাল বলছেন, এখানে না এসে পারি না। যেন কনফেস করার মতো, প্রেমিক যেমন প্রেমিকার সামনে বলে। রামকৃষ্ণ খুব আনন্দ পেয়েছেন; বলছেন, এই তো তোমার মনে রঙ লেগেছে। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনো পেনসিভ ধারণা মনে আসে না।

তীর্থরাজ। আমার একটা প্রশ্ন আছে। তুমি একটু আগে বলছিলে, একটাই মানবজীবন পেয়েছি, ঈশ্বরকে দেখেই যাব, দেখে না গেলে হয়? আর তুমি বলছ এই পরমের ধারণা গ্রাহ্য নয়। কিন্তু মাও-জে-দং যখন এঙ্গেলসের থেকে বেরিয়ে ‘নেতির নেতি’কে সমালোচনা করে বলছেন, এখানে প্রত্যেকটা ‘নেতি’র আগে ও পরে একটা করে ‘ইতি’ আছে। ‘ইতি’ বলতে ঐক্য বা কোনো একটা আদর্শের কথা বলছি। বা পরম। আমার মনে হয়, এই সিদ্ধান্তে মাও পৌঁছচ্ছেন মানুষকে দেখেই। মানব বিকাশের প্রধানতম শর্ত, শ্রমের প্রক্রিয়াটা, সেটাই প্রকল্পনা নির্ভর। তুমি বললে, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের কমিটেড শিষ্য ছিলেন। তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য আর পরমতাটা কী?

আদিদেব। বিবেকানন্দর কাজ সফল করতে রামকৃষ্ণ আইকন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন। উনি সুদে রামকৃষ্ণকে খাটিয়ে নিজের কাজ করেছেন। বিবেকানন্দের

দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাওয়ার একটা কারণ কিন্তু অর্থ সংগ্রহ। ওঁর মিশনের কাজে টাকাটা লাগবে। টাকা তো পশ্চিম দেবে। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে প্রাচ্য ফিলোজফির প্রচারক ছিলেন। রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার বিবেকানন্দের এজেন্ডা ছিল না।

অত্রি। প্রাচ্যবাদী পুনরুত্থানবাদী ধারণা। আমি কন্টেস্ট করছি ইওরোপের সঙ্গে; ইওরোপের একটা গ্রিক অতীত আছে। আজকাল শোনা যাচ্ছে, সেটাও নির্মিত অতীত। তেমনি আমাদেরও অতীতে বেদ ছিল।

আদিদেব। বিবেকানন্দকে আমেরিকার জনগণ মুখ্যত রামকৃষ্ণের শিষ্য বলে চেনে না। তিনি পৃথক একজন আইকন। তিনি পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল, ইন্ডিয়ান ফিলোজফির মুখপাত্র। তাঁর উদেশ্য হল, পাশ্চাত্যে আমি বক্তৃতা দেব, টাকা তুলব, শিষ্য তৈরি করব। বলছেন, আমি শুধুই ভালোবাসা দিতে পারি। চিঠির পর চিঠিতে এই কথা আছে। বিবেকানন্দ অসম্ভব ভাল চিঠি লিখতেন। হৃদয় ঢেলে দিতেন। রামকৃষ্ণ ওঁকে স্পিরিচুয়ালি ইন্সপায়ার করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের ফিলজফি নিয়ে উনি চলেন নি।

ভারত ঘোরাটা ওঁর মনের ওপর বিশালভাবে রেখাপাত করেছিল। দারিদ্র্য দেখছেন, কুসংস্কার দেখছেন, কঙ্কালসার শিশু দেখছেন; একবার নিজেকে মনে হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক। আবার এও মনে হল, সমাধান নাস্তিকতায় নেই। কখনো বদ্ধ সংস্কারকে আক্রমণ করছেন। এটাও স্ববিরোধিতা; এত যে সতী সতী করছ, একটা পুরুষ ‘সতা’ হয়ে দেখাও। আবার নারীর পাতিব্রত্যের প্রশংসাও। আবার বলছেন, ভালো হলেও ধর্মের পথে চলো, খারাপ হলেও ধর্মের পথে চলো; একটা নদী পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমেছে, তাকে তো গুটিয়ে পাহাড়ে তুলে দিতে পারো না! ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’-তে আছে, বুড়ো শিব এখনও ডমরু বাজাচ্ছেন আর মা-কালী পাঁঠা খাচ্ছেন। ধর্ম হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাণভোমরা। আদিম রাক্ষসী। তুমি যদি ধর্মকে উচ্ছেদ করতে যাও, তাহলে ভারতবর্ষের মানুষ তোমায় রিজেক্ট করে দেবে। তাই দেশের ভালো করতে গেলে ধর্মকে অবলম্বন করেই এগোতে হবে। তাই বেদান্ত ওঁর বেশি পছন্দ। সেখানে পৌত্তলিকতার ঝামেলা নেই। তিনি জোড়কলম

করছেন। খানিক সমাজতন্ত্র, খানিক বেদান্ত, একটা হিউম্যানিটেরিয়ান প্রকল্প। একটা মিশন বানাব, একটা ডিসপেনসারি থাকবে, কিচেন থাকবে, স্কুল থাকবে, একটা ইউনিভার্সিটি হবে। সাহেব ফিলানথ্রপিস্টদের মডেল সারা ভারতে চাইছেন।

আরেকটা কথা। উনি ৩৯ বছরে মারা যান। ৩০ বছর বয়সে তিনি শিকাগোয় প্রথম বক্তৃতা দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, উনি প্রৌঢ় ছিলেন না, যুবক ছিলেন। পণ্ডিত ছিলেন, হৃদয়বানও ছিলেন। আবেগে ছটফট করছেন। চিঠিতে লিখছেন, এত কাজকর্ম ঝক্কিঝামেলা সব অর্থহীন লাগছে। মনু যে বলেছিলেন, সন্ন্যাসীর সব ছেড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা উচিত, হয়তো তাই করলেই ভালো হত। আবার তেড়েফুঁড়ে বলছেন, কাজ করতে হবে। সবাই কাজে লাগ, ঘুমোচ্ছিস কেন, ওঠ। বেদ পড়। যা, মাধুকরী করে আন। আগুনের মতো কখনও আলো দিচ্ছেন, কখনও পুড়িয়ে দিচ্ছেন। সারাজীবন অসুখে ভুগেছেন। সাহিত্যিক শংকর সেই অসুখের লিস্ট করেছেন, লিখেছেন শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্। ভয়ঙ্কর সব ব্যাধি। ডায়াবেটিস। ইন্সোমিয়া। দু ঘণ্টা মোটে ঘুমোতে পারতেন। বলতেন, আমায় যদি কেউ ঘুম দেয়, তাকে আমি যথাসর্বস্ব দিয়ে দেব।

খানিক বাইপোলার ডিসঅর্ডারও হয়তো ছিল। মাথায় যেটা আসছে, তাকে তাড়াতে পারছেন না, সেই নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। কখনও চনমনে, আবার হঠাৎই বিমর্ষ।

অত্রি। যে জীবন বেছে নিয়েছেন, তার সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক নেই।

আদিদেব। উনি কিন্তু আধুনিকতার ফসল।

অত্রি। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে, সেখানে আধুনিকতার জন্ম হচ্ছে।

আদিদেব। কিন্তু ‘আধুনিকতা’ কথাটাও খুব স্ববিরোধী।

অত্রি। তাহলে কি তাঁর জন্মের সময়, বেড়ে ওঠার সময়ের সংঘাত কাজ করছে না?

আদিদেব। করছে। ওঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা, কলেজের শিক্ষা, স্পিরিচুয়াল সংস্পর্শ; এ সব নিয়ে তাঁর মধ্যে যে কাণ্ডটা ঘটছে, সেই কাণ্ড একজন আধুনিক মানুষেরই ঘটতে পারে। প্রাচীন লোক হলে সে শুধুই সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে। বিবেকানন্দ সেটা করেন নি। ফান্ড জোগাড় ক'রে আমেরিকা যাচ্ছেন। শীতের রাতে প্যাকিং বাক্সের ভিতর শুচ্ছেন। যে চিঠি এনেছিলেন সেটা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁকে নিগ্রো ভেবে লোকে ঢিল ছুঁড়ছে। ধর্ম মহাসভায় যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষ অবধি অনেক কাণ্ড ক'রে পৌঁছলেন। মনে জোর এনে পনেরো মিনিট বললেন, হাততালির বন্যা বয়ে গেল।

যে সব সাধক ব্যক্তি নিজের সিদ্ধির জন্যে চেষ্টা করেন এবং পরের ক্ষতি করেন না, তাঁদের প্রতি বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু বুঝছেন, এতে সকলের উন্নতি হবে না। দেশে ইন্ডাস্ট্রি লাগবে। গান্ধীর সঙ্গে বিবেকানন্দের এখানে পার্থক্য আছে। বিবেকানন্দ টাটাকে ইন্সপায়ার করেছেন কেন? বলছেন, পাশ্চাত্যকে দিতে পারি জ্ঞান, তার বদলে আমরা নেব বিজ্ঞান, প্রযুক্তি। এই এক্সচেঞ্জে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু বুঝতে পারেন নি যে ঐ এক্সচেঞ্জে দরকার নেই, পুঁজিবাদের আগলি রূপ এমনিতেই দেখা দেবে, নিজে থেকে দিতে বা নিতে হবে না। সে এমনিতেই আবির্ভূত হবে। এমনিই মিলে যাবে এবং খুব বিষাক্তভাবেই মিলবে। বিবেকানন্দ বিশ্বযুদ্ধ দেখেন নি। উনি ১৯০২তে প্রয়াত হচ্ছেন।

অত্রি। উনি টাটা বিড়লাদের ন্যাশনাল বুর্জুয়া হয়ে যাওয়া দেখেন নি।

(অন্য একটি প্রশ্ন করি।) রামকৃষ্ণ জীবনীগ্রন্থ ছিল রামচন্দ্র দত্ত-এর, ১৮৮০তে লেখেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত'। প্রথম রচিত জীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে একটা। এটা নিয়ে দুই স্কলার নরসিংহ শীল আর জেফ্রি কৃপাল বলেছেন, এটা একটা স্ক্যান্ডালাস জীবনী, 'কন্টেনিং দ্য লিউরিড ডিটেলস অব হিজ সাধনা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ কোয়াইট সাজেস্টিভ এনকাউন্টার উইথ হিজ প্যাট্রন মথুর। ...রামচন্দ্র দত্ত, ওয়ান অব দ্য আর্লি বায়োগ্রাফার অব রামকৃষ্ণ, ইজ রিপোর্টেড টু হ্যাভ সেইড, উই হ্যাভ হার্ড মেনি টেলস অব দ্য ব্রাহ্মণী, উই ভিজিটেড টু ডিভালজ দেম ইন দ্য

পাবলিক।' ব্রাহ্মণী বা ভৈরবী যাই হোক, তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার যে আচারক্রিয়াজাত সম্পর্ক, এটা তো তান্ত্রিকী দীক্ষা। একে সেন্সার করা হচ্ছে। এবং বিবেকানন্দ, এই বিষয়গুলো প্রচার করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসছেন। এ সম্পর্কে তোমার মত কী? আর এটা কোন নীতি কাঠামো থেকে হচ্ছে?

আদিদেব। আমার অবাক লাগল। যাই হোক, এই বই আমি পড়ি নি।

অত্রি। পাওয়া যায়।

আদিদেব। পড়তে হবে। কিন্তু তাঁর তান্ত্রিক জীবন সম্পর্কে অনুমোদিত জীবনী 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'-তে খুব ডিটেলে বর্ণনা আছে। ভৈরবী যে তাঁকে নরমাংস খাইয়েছেন, যুবতীর কোলে বসিয়ে সাধনা করাচ্ছেন, এ সব লেখা আছে, সে সব নিয়ে কি রামকৃষ্ণ মিশন আপত্তি করেছে? ন্যাচারালি এ সব বামাচারের অংশ। তবে রামকৃষ্ণ মিশন 'কালী'জ চাইল্ড' বই নিয়ে আপত্তি করেছে। স্বামী ত্যাগানন্দ একটা বিরাট চিঠি লেখেন। রামকৃষ্ণের জীবনের হোমোইরোটিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে, তাঁর বালকপ্রীতি নিয়ে, কালীদর্শন ইত্যাদি দিয়ে জেফ্রি কৃপাল থিসিস দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। এই বই নিয়ে ব্যাপক ঝঞ্ঝাট হয়। বই লিখে কৃপাল পুরস্কার পান ঠিকই, কিন্তু সমস্যা এড়ানো যায় নি।

(কিন্তু) আমার মনে হয়, রামকৃষ্ণ মিশনের নৈতিক পতন হয়েছে সে দিন থেকে, যে দিন বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর রাখাল মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, নিবেদিতাকে মিশনে আসতে নিষেধ করেন। যে নিবেদিতা সব কিছু ছেড়ে ভারতবর্ষকে পাগলের মতো ভালবেসেছিলেন, তাঁকে ডেকে বলছেন, তোমায় এখানে আর আসতে হবে না। কেন? তুমি বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা কর। এখানে পুলিশি ঝঞ্ঝাট চাই না। তুমি আর মিশনে এসো না।

তীর্থরাজ। রামকৃষ্ণ মিশনের বয়ান, নিবেদিতা পদত্যাগ করেছেন।

আদিদেব। রামকৃষ্ণ মিশন তাঁকে দিয়ে খবরের কাগজে চিঠি লেখায়। তিনি বাধ্য হয়ে চিঠি লেখেন, এরপর তিনি যা করবেন, নিজের দায়িত্বে করবেন। বিবেকানন্দ

মারা যাওয়ার পরে নিবেদিতা বেশিদিন বাঁচেন নি, নয় বছর পরেই মারা যান। বিবেকানন্দ মারা যাওয়ার পরে মিশনের পাগল পাগল অবস্থা। তখন তাঁদের ডিফেন্সিভ খেলতে হচ্ছে। আমাদের গুটিয়ে নিতে হবে, রক্ষণশীল হতে হবে। এটাই তাঁদের সে সময়ের ডিফেন্স মেকানিজম।

হোমোইরোটিসিজম আর রামকৃষ্ণ নিয়ে অরুণেশ ঘোষ লিখেছেন ‘র‍্যাঁবো ও রামকৃষ্ণ’। উনি বালকদের ব্যাপক পছন্দ করতেন। কিন্তু সাধক ও ভাবোন্মাদদের পক্ষে এগুলো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই নিয়ে সংস্কারটা পাশ্চাত্য থেকে এসেছে। এটা থাকলে তিনি ‘ধনে হাত দিয়ে ফচকেমি করতুম’ বলতে পারতেন না। তখন যৌনতা নিয়ে যেসব মেডিকাল বই লেখা হচ্ছে, তাতে হোমোসেক্সুয়ালিটি অসুখ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে, পায়ুকামকে অসুস্থতা বলা হচ্ছে। পশ্চিমা সেক্সোলজিস্টদের বই পড়ে এদেশীয়দের মাথা গেছে।

অনামিকা। সেক্সুয়াল এক্টিভিটিকে তারা ট্রান্সগ্রেশন হিসেবে দেখছে।

আদিদেব। রামকৃষ্ণ তখন সাবভার্সিভ কাজ করেছেন। তিনি অনায়াসে মেয়েদের অন্দরমহলে ঢুকে পড়তে পারেন, নটী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করতে তাঁর সমস্যা হয় না। এগুলো খারাপ চোখে দেখা হয়েছে। এ লোকটা কেমন একটা। এ লোকটার হাবভাব ভাল না। বলা হচ্ছে তিনি ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন, এটা একটা যৌনগন্ধী ইঙ্গিত।

বিবেকানন্দের মা শেষ জীবনে গর্ব করে বলতেন, আমার ছেলে ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছে। যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত বন্ধুবান্ধবসহ যখন রামকৃষ্ণের কাছে যাওয়া শুরু করছেন, রামকৃষ্ণ সাদরে তাঁদের ডেকে নিচ্ছেন, তোরা কোথায় ছিলি এতদিন ! বিষয়ী মানুষদের সঙ্গে কথা বলে বলে মুখ পচে গেছে।

আমরা আজ যে ইওরোপ আমেরিকা দেখি সেটা আগে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। মা কী ছিলেন, কী হইয়াছেন - ভাবা যায় না। ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংলন্ডে ছাত্রদের পকেট ছোটো রাখা হত; বড়দের ধারণা ছিল, তা না হলে তারা পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিরন্তর মাস্টারবেট করবে। বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় যাচ্ছেন তখন সেই দেশ চূড়ান্ত রক্ষণশীল।

অত্রি। হেনরি মিলারের প্রিয় বই ছিল ‘গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ’।

আদিদেব। হ্যাঁ। বাই ‘এম’। হবে নাই বা কেন? এত ভালো বই ক’টা আছে? এই বই পড়ে বাংলা ভাষা শেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রকম একটা বই হল ‘লোকরহস্য’। খুবই আন্ডাররেটেড বই। ওঁর নভেলগুলির চেয়ে ঢের ভালো। ‘লোকরহস্য’-র লেখক হিন্দুত্বের উদ্‌গাতা হবেন, খুবই উদ্ভট ব্যাপার। লেখক এখানে বাঙালির ইংরেজপ্রীতি থেকে, ধর্মান্ধতা থেকে সব কিছুই বিদ্রূপের লক্ষ করেছেন। উদাহরণ দিই। ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের সভা হচ্ছে সুন্দরবনে। বৃহল্লাঙ্গুল বলছেন, আমি একসময় মানুষের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। মানুষের কাজ কী? জন্তুদের সেবা করা। ওরা আমাকে চিড়িয়াখানায় রেখেছিল। খুব ভালো খেতে দিত। আমি মানুষের সমাজনীতি জেনে এসেছি। সেটা কীরকম? পুরুষ নারীর মধ্যে বিয়ে দেয় পুরোহিত। বাঘেরা তো আর পুরুতগিরি কী জানে না, ব্যাঘ্রাচার্য তাদের বোঝাচ্ছেন, যে চালকলা খায়, তাকে বঞ্চকও হতে হবে, চালকলাভোজী বঞ্চক হল পুরোহিত। বেনারসে প্রচুর ষাঁড় আছে যারা চালকলা খায়, কিন্তু তারা বঞ্চনা করে না, অতএব তারা পুরোহিত নয়। বঙ্কিম ইংরাজস্তোত্র লিখছেন, ব্র্যাকেটে লিখছেন মহাভারত হইতে অনুবাদিত। উচ্চশিক্ষিত বাঙালি স্ত্রীকে বলছেন, কী সব ন্যাস্টি বই পড়ো। স্ত্রী বলছেন, পড়েই দেখ না। উচ্চশিক্ষিত বই নিয়ে দেখছেন, দান্তে-র অনুবাদ। বাই জোভ। দান্তে কে জানো না, যিনি ফোর্টিন্থ সেঞ্চুরিতে ফ্লারিশ করতেন? ইংরেজি-অনভিজ্ঞ স্ত্রী উত্তর দিচ্ছেন, ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করতেন? এত বড় কবি? এরকম বই কটাই বা আছে? ‘লোকরহস্য’, ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’, ‘কথামৃত’, বা ধরো ‘বিবেকানন্দের পত্রাবলী’ এবং ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’। বিবেকানন্দ কিছু কিছু আপত্তিকর কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু গুরুচণ্ডালী ঐ গদ্য কত প্রাণবান। বিবেকানন্দ চিন্তক হিসেবে ভুল করতে পারেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়বত্তা প্রশ্নাতীত। ধর্ম নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

অত্রি। কেউ ধরো বলল, ‘কথামৃত’ একটি পুরুষতান্ত্রিক বই।

আদিদেব। (কথাটা মিথ্যে নয় যদিও)। নাস্তিক এভাবে বিচার করে না। নাস্তিক গোঁড়া হবে কেন? সে তো মুক্তমনা। নাস্তিকতা তো ধর্ম নয়। এটা একটা স্ট্যান্ড।

নাস্তিক এক বিজ্ঞানীকে যদি শুধোনো হয়, আপনি ঈশ্বর মানেন না কেন? উনি বলবেন, যুক্তির আওতাতেই আসে না। অতএব বুঝি না। কী ক'রে মানব? নাস্তিকতার মূল নির্দেশ হল 'টু ডাউট'। যদি সন্দেহই করি, তাহলে পরমকে মানব কী ক'রে? বাইবেল-গীতা যাই হোক, আপনাকে প্রশ্ন-তর্ক করতেই হবে। এবং তখনই আপনাকে তারা বের করে দেবে।

একমাত্র ফাশিস্তরা বই পোড়াতে পারে। যদি কেউ বলে, পুরুষতান্ত্রিক বই ব্যান কর, পোড়াও, তার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সে নাস্তিকতায় কোয়ালিফাই করে না। নাস্তিক হওয়া মানে এই নয় যে কয়েকটা জার্গন শিখে সে সব কপচে যাওয়া। যদি এরকম ঘটনা ঘটে, এই যাদবপুরের আকাশটা ফাঁক হয়ে গেল আর ঈশ্বর ঘোষণা করলেন, এই ছোকরা, আমায় দেখতে পাচ্ছ না? তাহলে অন্য কথা! কিন্তু আমরা জানি এটা হবে না। প্রকৃতিতে অলৌকিক কিছুই ঘটে না। আর যদি এরকম কিছু ঘটে তো সেদিন প্রলয় আসবে। এটা আমি পড়াশোনা করে, কিছুটা অভিজ্ঞতায় জেনেছি। আমায় প্রকৃতিবাদীও বলতে পার।

অত্রি। প্রকৃতির আইন।

আদিদেব। হ্যাঁ। প্রকৃতির আইন। তাকে ভাঙা যায় না।

এবার দেখো, রামকৃষ্ণ থেকে কার্ল মার্ক্স যেই হোন, আইকন হওয়া মাত্র তা সমস্যায় পরিণত হয়েছে। নিকানোর পাররা-র 'ইউএসএ' কবিতায় যেমন ছিল, 'স্বাধীনতা যেখানে একটা মূর্তি'। স্বাধীনতাকে তো মুক্ত করতে হবে। লেনিনের মূর্তি দিয়ে আখেরে কী হবে? এইটা কোনো বিপ্লবী কাজ হল? প্রতিমাপূজা, আইকনিজম এসব যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাপার। স্ট্যাচু ভেঙে যেতে প্রমাণ হয়, জনতার কাছে ওটা অভিশাপের মত মনে হয়েছিল। অবশ্য তারপরেই নয়া-পুঁজিবাদ বিমূর্ত আইকন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

অত্রি। তাহলে কি ইর্‌যাশনালিটি থাকবে না?

আদিদেব। কল্পনা খুব পাওয়ারফুল জিনিস। কিন্তু আমাদের কল্পনায় আছে বলেই,

তাকে বাস্তবে নিয়ে আসতে হবে নাকি? রামগরুড়ের ছানা আদৌ আছে কি তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ?

অত্রি। আমি গডম্যানের কথা বলছি না। ধরো একজন মানুষ, সে বিশ্বাস করে অলৌকিকতার অস্তিত্ব আছে। কেউ বিশ্বাস করে, রামকৃষ্ণ যে আঙুলটা বেঁকালেন, তার জন্য আমার জীবনের দুর্দশাটা খানিক বেঁকে গেল। এই লোকটাকে নিয়ে কী করব? বারবার বোঝানোর চেষ্টা করব আমার র‍্যাশনালিটি?

আদিদেব। তোমার প্রশ্ন বুঝতে পারছি। এটা একটা পলিটিক্স। ক্লাসে পড়াচ্ছিলাম, মানে আমিই পড়ছিলাম, আমার কথা তো কেউ শোনে না, তাই আমি নিজেকে নিজেই পড়াই। মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস আছে, তাদের এক রাজা আছে, বিপদ এলেই তিনি জল থেকে উঠে আসেন। তিনি হাতির পিঠে চড়ে প্রতিরোধ করেন। এটা তাদের বিশ্বাস। তারা চাঁদের চলনের হিসেবে সময়ের হিসেব রাখে। গল্পের নাম ‘এতোয়া মুণ্ডার কাহিনী’। এই যে বিশ্বাস, এর একটা পলিটিকাল গুরুত্ব আছে। গল্পের লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী নাস্তিক হয়েও এটাকে গুরুত্ব দেন। তিনি গুরুত্ব দেন, এবং তিনি আধুনিক মানুষ। তিনি মুণ্ডাদের মধ্যে বড়ো হন নি। তিনি এম্প্যাথেটিক, কিন্তু দেখাটা নাগরিকের চোখ থেকে। আমার দেখা, তোমার দেখা তাই হতে বাধ্য। সেই ‘আগন্তুক’ ফিল্মে উৎপল দত্তের ডায়লগের মতো, আমি লজ্জিত যে আমি জংলি নই। কিন্তু আমি তো আসলেই তা নই। এটা সমস্যা।

অত্রি। এটা কিন্তু ওরিয়েন্টালিস্ট ভিউ। আমার ওই ওরিয়েন্টেশনই নেই।

আদিদেব। ঋত্বিক ঘটক ইন্টারভিউতে বলেছেন, ঈশ্বর মোস্ট ভেগ জিনিস। মানুষকে বোকা বানানোর জন্য, ঠকাবার জন্য সেটা তৈরি হয়েছে। জনমানুষের কৃষ্টি নিয়ে উনি অবসেসড। ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-তে তিনি বলছেন, দেখো বাবা, আমাদের ভারতবর্ষ কয়েক হাজার বছরের পুরোনো দেশ। এর মধ্যে কয়েক হাজার বছরের পুরোনো চিন্তা জন্মগ্রহণ করেছে। চিন্তকেরা বদমাইশদের হাতে বহু ফিচলেমির অস্ত্র তুলে দিয়েছে। ওদের দোরগোড়াটা ভালো করে চিনতে হবে। ঋত্বিক জানেন, আমি যদি কৃষ্টির গভীরে ঢুকতে না

পারি, তাহলে আমিও তাকে চিনতে পারব না। আমাকে ছৌ নাচ বুঝতে হবে। সূক্ষ্ম জিনিসগুলো জানতে হবে। ঋত্বিকের ছৌ দেখা পলিটিকাল দেখা। কিন্তু যে ছৌ নাচছে, তার দেখা আর আর ঋত্বিকের দেখা এক নয়।

আমি তার দেখাকে অসম্মান করছি না, কিন্তু তার দেখাটা আলাদা দেখা। তাকে আমি কিছুটা ঈর্ষাই করছি, কিন্তু আমি একটা ক্রিটিকাল দেখা দেখছি। এই আধুনিকতার অসুখে আমরা ভুগি।

অত্রি। সে হয়ত ভরে বিশ্বাস করে...

আদিদেব। হ্যাঁ, কিন্তু আমি ভরগ্রস্তকে দেখে বলব এর হিস্টিরিয়া হয়েছে। জানি আমি একটা বিশেষ সম্প্রদায়েই ঢুকে যাচ্ছি। এটা অস্বীকার ক’রে লাভ নেই। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে এক মহিলা চুল এলিয়ে বসে আছে, মন্ত্র পড়ে তার ভূত ছাড়ানো হচ্ছে। আমি এটা সমর্থন করতে পারব? তুমি পারবে? অমুক মহিলা ডাকিনীসিদ্ধ, তিনি রোগীর মাথায় হাত রাখলেই অসুখ সেরে যাবে, তুমি কি সেখানে তোমার বাচ্চাকে নিয়ে যাবে? এটা আমারা মানতে পারি না। আমাদের একটা অন্যরকম মন তৈরি হয়ে গেছে।

অত্রি। কমলকুমারের রামকৃষ্ণকে তুমি কীভাবে দেখছ?

আদিদেব। কমলকুমারের ব্যাপারটা এত গোলমেলে...

অত্রি। স্ট্রাটেজিক্যাল?

আদিদেব। মনে হয়, তাই। কমলকুমারের একটা বিখ্যাত ইন্টারভিউ পাওয়া যায়, ‘সমতট’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারের শেষ প্রশ্নে শুধোনো হল, আর গুরু? কমলকুমার বলেন, আপনাদের গোপনে বলি, ওটা হল পাবলিক রিলেশন। আমারও মনে হয়, লেখার শুরুতে বারম্বার ‘জয় রামকৃষ্ণ, মাধব বর্গভীমাতে’ এইসব বলা আদতে পি-আর।

‘অন্তর্জলী যাত্রা’র ভূমিকায় লেখক বলেছেন, এই গ্রন্থের ‘কাব্যবিগ্রহ’ রামপ্রসাদের আর ‘ভাববিগ্রহ’ রামকৃষ্ণের। এ দুটি চমৎকার শব্দ। আমরা

'কন্টেন্ট' আর 'ফর্ম' ব্যবহার করি। 'কন্টেন্ট' হচ্ছে 'ভাববিগ্রহ', যা রামকৃষ্ণের। 'ফর্ম' হচ্ছে 'কাব্যবিগ্রহ', যা রামপ্রসাদের। কন্টেন্ট ও ফর্মের বদলে 'থিম' ও 'স্টাইল'ও চলতে পারে। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র কাব্যবিগ্রহ কিন্তু আসলে রামপ্রসাদের নয়, ওটা কমলকুমারেরই।

লেখকের এটা একটা পোজ, এই পাপী লোকগুলো তো কারোর নাম শোনে না, তাই দুটো নাম বললুম। 'অন্তর্জলী যাত্রা'কে কীরকম লেখা বলব, প্রোগ্রেসিভ নাকি রিগ্রেসিভ? কমলকুমার কাদের নায়ক করেছেন? তাঁর নায়ক বৈজুনাথ চণ্ডাল, সাঁওতাল মতিলাল পাদ্রি, ডোম বালক সুঘরাই, জারজ সন্তান লখাই, যার মা কামিন আর সে জন্মেছে ব্রাহ্মণের ঔরসে। তার গ্রামতুতো দিদি সুহাসিনী ব্রাহ্মণকন্যা, দুজনে অসম্ভব বন্ধু।

কমলকুমার অগ্নিযুগের পটভূমিকায় 'রুক্মিণীকুমার' গল্প লেখেন। গল্পের শেষ বাক্য হল, প্রকাশ থাক এই কলিকাতার রাস্তায় রাইফেলের গুলিতে রুক্মিণীকুমারের মৃত্যু ঘটে। যেন মৃণাল সেনের সিনেমার দৃশ্য। পটভূমি স্বাধীনতা আন্দোলনের, কিন্তু গল্পটা আমাদের দেখায় উনিশশো একাত্তরের ছবি। সেই হ্যালুসিনেশনটা তিনি ব্যবহার করছেন।

আরেকটা গল্প হচ্ছে 'খেলার আরম্ভ'। গোটা গল্পে একটা ছেলে মাইম করে দেখাচ্ছে নকশাল আন্দোলনের বিভিন্ন দৃশ্যের। কখনও দেখাচ্ছে মাও-এর মুখ, কখনও দেখাচ্ছে পুলিশের জিপ ধেয়ে আসছে, কখনও দেখাচ্ছে নকশাল যুবকের লাশ, এই দেখে কলকাতার বুর্জোয়ারা ড্রইংরুমে বসে খিলখিলিয়ে হাসছে। নকশাল আন্দোলন যেন একটা সার্কাস, দর্শকেরা বলছে কী চমৎকার পারফর্ম করছে দেখো ছেলেটি। কমলকুমার তাদের উদ্দেশ্য ক'রে একটা লাইন লেখেন, ঠাকুর করুন তোমাদের ধড়ে শকুনও না বসে। উনি হাই সোসাইটিকে এতটা ঘেন্না করতেন। কমলকুমার কী করে রিগ্রেসিভ লেখক হন?

তিনি নিজেকে আপারক্লাস বলছেন, কেন বলছেন জানি না। কী তার গূঢ় অর্থ, শুধু আন্দাজ করতে পারি। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে তিনি চিঠিতে লিখছেন শিল্পীর অভিমান নিয়ে, সেই অভিমান কুলীন বা আপারক্লাস হতে পারে।

তিনি বলছেন, দেশের, ব্র্যাকেটে ম্যাপের, জন্য কিছু লিখিও না, নিজের জন্য লিখিও।

অত্রি। তিনি নিজেকে হিন্দু বলেছেন।

আদিদেব। সেটা বিজেপির হিন্দু না। কমলকুমার দাঙ্গার বিরুদ্ধে নিজের স্পষ্ট অবস্থান নিয়ে চিঠি লেখেন সন্দীপনকে। যিনি কথায় কথায় ফরাসি বয়েত ঝাড়ছেন বা খালাসিটোলায় গিয়ে টাগরায় বাংলা ঢালছেন, তারপরে সুনীলের পিঠে হাত রেখে বলছেন, কী সুনীল, তোমাদের দেশে ('দেশ' পত্রিকায়) এ বছর কেমন ফলন হল? এরকম লোককে বিজেপি দলে নেবে বলে আমার মনে হয় না।

অত্রি। রামকৃষ্ণ সমসাময়িক নবজাগরণীদের পাটোয়ারি বুদ্ধি বলছেন আর কমলকুমার সত্যজিতকে ঢ্যাঙা বলছেন।

আদিদেব। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়েও রামকৃষ্ণ রঙ্গ করেছেন। ...দেখলাম বুকটা লাল, রাজর্ষি মনে হল। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো। সেই যে বাবু ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করছে আর পাঁঠা খান না কেন? উত্তর দিচ্ছে, কী করে খাব, দাঁত পড়ে গেছে। রামকৃষ্ণ অতীব চতুর। ...আপনি জাত মানেন? উত্তরে বলছেন, কই আর মানি, কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি। এঁকে অত সহজে খোপে পোরা যাবে না।

একটা ব্যক্তিগত কথা এখানে মনে পড়ছে। অত্রি আমাকে একবার বলেছিল, এ তো তুমি কমিউনিস্টদের মতো কথা বলছ। আমি বললাম, তারা আমায় দলে নেবে না। তাহলে কি তুমি অ্যানার্কিস্ট? বললাম, তারাও আমায় নেবে না। আমায় কেউ না নিক, অসুবিধে নেই। 'আউটসাইডার' পরিচয়ই ভালো।

গ্রন্থপঞ্জি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (অখণ্ড)। শ্রীম। উদ্বোধন কার্যালয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত। রামচন্দ্র দত্ত। যোগোদ্যান কাঁকুড়গাছি সেবকবৃন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ। স্বামী সারদানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়।

পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নূতন নিয়ম)। ভারতের বাইবেল সোসাইটি।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রতিটি খণ্ড)। স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়।

পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন। সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈব্যা পুস্তকালয়।

বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য খণ্ড)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তুলি-কলম।

সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা। কালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পা. অরুণ নাগ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিবিধ প্রসঙ্গ। বিপিনবিহারী গুপ্ত। সম্পা. প্রসাদ সেনগুপ্ত। কমলিনী।

উপনিষদ (প্রথম খণ্ড)। অনু. পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। ব্রাহ্মমিশন প্রেস।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (অখণ্ড)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সিগনেট প্রেস।

সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অনু. সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত ও সৈকত নিয়োগী। অনুষ্টুপ।

অচেনা অজানা বিবেকানন্দ। শংকর। সাহিত্যম।

উপন্যাস সমগ্র। কমলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

গল্পসমগ্র। কমলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

উপন্যাস সমগ্র। নবারুণ ভট্টাচার্য। দে’জ।

উপন্যাস সমগ্র (২)। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। আজকাল।

কবিতাসংগ্রহ (১)। জয় গোস্বামী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

টিনের তলোয়ার। উৎপল দত্ত। মিত্র ও ঘোষ।

অর্ধেক জীবন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

প্রথম আলো (অখণ্ড)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

নিজের পায়ে নিজের পথে। ঋত্বিককুমার ঘটকের কথা-কোলাজ। মনফকিরা ও সিনে সেন্ট্রাল।

নিকানোর পাররার শ্রেষ্ঠ কবিতা ও প্রতিকবিতা। অনু. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দে’জ।

কমলকুমার। প্রশান্ত মাজী। পারুল।

কমলকুমার বিশেষ সংখ্যা। সম্পা. অনিল আচার্য। অনুষ্টুপ।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড সংখ্যা। সম্পা. সুবল সামন্ত। এবং মুশায়েরা।

কথায় কথায়। সম্পা. উৎপলকুমার বসু। সৃষ্টি প্রকাশনা।

মাও সে তুং-এর রচনাবলী । নবজাতক প্রকাশনী।

পাতাবাহার (পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্য)। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

The Gospel of Sri Ramakrishna. Mahendranath Gupta. Tr. Swami Nikhilananda. Ramakrishna-Vivekananda Centre.

Ashtavakra Gita. Tr. Swami Nityaswarupananda. Advaita Ashrama.

Civilization and its discontents. Sigmund Freud. Tr. Joan Riviere. Hogarth Press, London & Institute of Psycho-analysis.

Kali’s Child: The Mystical and the Erotic in the Life and Teachings of Ramakrishna. Jeffrey J. Kripal. University of Chicago Press.

Interpreting Ramakrishna: Kali’s Child Revisited. Swami Tyagananda, Pravrajika Vrajaprana. Motilal Banarsidass Publishing House.

Ramakrishna Revisited: A new biography. Narasingha P. Sil. University Press of America.

The dictionary of accepted ideas. Gustave Falubert. Tr. Jaques Barzun. New Directions Paperbook.

(তালিকা সংক্ষেপিত)

বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি চিঠি

[সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষালের মধ্যে এই পত্রবিনিময় ছাপা হয়েছিল শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রীর বৈদিক ভারত (1990: প্রকাশক আনন্দমোহন ঘোষাল, - ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা 700 013) বইতে। দুষ্প্রাপ্য এই চিঠিগুলি সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। একজন বেদপন্থী চিন্তাবিদ এবং একজন বস্তুবাদী চিন্তাবিদের বিশ্লেষণে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের কী মূল্যায়ন হয়েছে তা অনেকের কাছেই কৌতূহলজনক হতে পারে মনে করে এই চিঠিগুলি প্রকাশ করা হল। বলা হয়তো বাহুল্য নয় যে চিঠিগুলিতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই চিঠি-লেখকদের নিজস্ব। সম্পাদক, মানবমন।]

পত্রলেখক-পরিচিতি

শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল (1928-1987)

দি বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে নর্মদার উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে গুজরাটের ভৃগুকচ্ছ (যেখানে নর্মদা সমুদ্রে মিশেছে) পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করেন। 1957 সালে বিশুদ্ধ বেদপন্থী এই লেখকের প্রথম গ্রন্থ আলোক-তীর্থ প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বেদ-বিরোধী মূর্তিপূজা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভুল ধারণা খণ্ডন করেন। রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুসমাজ এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, সুকুমার সেন, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চিন্তাবিদ এই সৎ প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। ‘উভয় শিবিরে অবিরাম শরবৃষ্টির মতো পত্রাঘাত চলতে লাগল কখনও ডাকযোগে, কখনও বা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। সেই রকম দু’-একটি পত্র’ প্রকাশিত হয় তাঁর বৈদিক ভারত বইতে। এখানে প্রকাশিত চিঠিগুলি এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচিতির অনেকটা ঐ বই থেকে নেওয়া। 1959 সালে আলোক-বন্দনা বই লিখে শৈলেন্দ্রনারায়ণ তাঁর সমালোচকদের জবাব দেন। এছাড়া বেদান্ত, পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বহু রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (1901-1974)

1921 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইকনমিক্সে অনার্স সহ বি.এ পাশ করে, যখন ইউরোপ যাওয়ার উদ্যোগ করছেন, তখন দেশে গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ইউরোপে যাওয়া বন্ধ করে গণসমুদ্রের সেই ঢেউয়ের টানে তরুণ সৌম্যেন্দ্রনাথ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঠাকুরবাড়ির এক তরুণ নগ্নপদে এবং নগ্নগাত্রে চৌরঙ্গির মোড়ে দাঁড়িয়ে খদ্দর বিক্রি করছেন বাংলাদেশে সে এক অকল্পনীয় দৃশ্য। কিন্তু তিনি যখন বুঝলেন যে, সে যুগের কংগ্রেসী

রাজনীতি মধ্যবিত্ত বাবুদের বৈঠকখানার আড্ডাতে পরিণত হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না। তাঁর মন যখন বিপ্লবমুখীন সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট তখন বাংলাদেশে কাজী নজরুল, অতুল গুপ্ত, হেমন্ত সরকার, মজফ্‌ফর আহমেদ প্রভৃতিদের গঠিত একটি দল ছিল, তার নাম কৃষক-শ্রমিক পার্টি। সৌম্যেন্দ্রনাথ এই পার্টিতে যোগ দিয়ে 1927 সালে এর সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। এর কিছুদিন পরেই ডিসেম্বর মাসে তিনি ইউরোপ-চলে গেলেন এবং ফ্রান্স ও জার্মানি ঘুরে রাশিয়াতে গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে তিনি কম্পিটার্নের অধিনায়ক পলিটব্যুরোর সদস্য বুখারিনের কাছে হাতে-কলমে কম্যুনিজমের পাঠ নিতে শুরু করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'লেনিন-কোর্স' অর্থাৎ লেনিন-শিক্ষা-নিকেতনেও ভর্তি হয়েছিলেন। এইভাবে স্তালিন, ট্রটস্কি, তরোশিলভ, মলোটভ, পেত্রভস্কি প্রভৃতি বিখ্যাত সোভিয়েট নেতাকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা ও চেনার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। 1928 সালে মস্কোতে কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের যে ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেস হয়, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথও সেই সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। ইউরোপ সফরকালে ফ্রান্স জার্মানির সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন করাই ছিল তখন তাঁর প্রধান কাজ। 1928 সালে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হলে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের সংঘাত ঘটে। 1937 সালে তিনি গঠন করেন রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া। 1930 সালে ইউরোপে 'আগুন' ও 'শৃঙ্খল' নামে বিশ্ববিখ্যাত দুটি বই-এর লেখক ফরাসি মনীষী আঁরি বাবুসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইতিমধ্যে জার্মানিতে ফ্যাসিজম্ তথা হিটলারের অভ্যুদয় ঘটেছে। মানুষের সভ্যতার বিরুদ্ধে ফ্যাসিজম্ যে একটা সর্বনাশা বর্বর অভিযান, সে সম্বন্ধে তিনি সমগ্র জার্মানিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। ফল হল এই যে, ক্রুদ্ধ হিটলার তাঁকে মিউনিখ জেলে আটক করলেন এবং পরে জার্মানি থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ চলে গেলেন ফ্রান্সে।

রোঁমা-রোলাঁর সঙ্গে এই সময় তাঁর অন্তরঙ্গতা জন্মে। রোমাঁ-রোলাঁর সঙ্গে কথোপকথন কালে তিনি গান্ধীবাদের যে-কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, 'With Romain Rolland on Gandhism' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

দেশে ফেরার পর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। প্রায় আট বছর জেলে কাটান। 14টি ভাষায় কৃতবিদ্য, একাধারে সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ সৌম্যেন্দ্রনাথের লেখা Hitlerism of the Aryan Rule, The Hour has Struck, French Revolution, United Front of Betrayal, People's front or the front against the people, Permanent Revolution, On self determination of Nations, Communism and Feushism, Tactics and strategy of Revolution, রোজা লুক্সেমবুর্গ, কার্ল লিবকনেখট, সেভিয়েট রিপাব্লিক প্রভৃতি অজস্র পুস্তিকা ছাড়া রাশিয়ার কবিতা, মশাল কবিতা, হাইনারের

শ্রেষ্ঠ কবিতা, Universal Heroism of Rabindranath, যাত্রী, Against the Stream, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ, কালিদাসের কাব্যে ফুল, Israil curio curio, রামমোহন রায় ব্রহ্মসভা না ব্রাহ্মসমাজ, ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের গান, যুক্তিবাদ, আধুনিকতা ও আনন্দ মীমাংসা প্রভৃতি বইগুলি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদ।

যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে ফ্যাসিবাদী যে আন্দোলন এদেশে গড়ে ওঠে কিংবা 1938 সালে জননায়ক শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি কমিটি হয় তিনি ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক রাশিয়া সফরকালে সৌম্যেন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহযাত্রী এবং সম্পাদক। 'যাত্রী' নামক তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন- "যাকে রাজনৈতিক ব্যক্তি বলা চলে সে লোক আমি নই। সাময়িক সাফল্যের অপদেবতার পায়ে আমার আদর্শকে বলি দিতে আমি কখনও রাজী হইনি। রাজনীতির হাটে চোরাকারবারীর অন্ত নেই। যে বাড়ীতে আমি জন্মেছিলুম সেখানে এমন সব লোক আমি দেখেছি আর তাঁরা তাঁদের জীবনের ছোঁয়া দিয়ে এমন কোরে আমার মনের তার বেঁধে দিয়েছেন যে, তার সুর নামিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। জীবনের কোনক্ষেত্রেই পাটোয়ারী বুদ্ধি প্রয়োগ করা আমার সাধ্যের বাইরে। তাই জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'রিয়্যাল পলিটিকার' অর্থাৎ কিনা বাস্তব রাজনীতির পাটোয়ারী, তা আমি কখনও হয়ে উঠতে পারলাম না।"

তিনি নিজেকে কম্যুনিস্ট বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসলেও কম্যুনিজমের নামে যে কাঠমোল্লাগিরি বা regimentation of thought, তা তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাই দেখি 1931 সালে ম্যাক্সিম গর্কির মতো লোকের মুখের ওপর কম্যুনিজমের দোষগুলি অত্যন্ত তেজের সঙ্গে তিক্ত ভাষায় প্রকাশ করতে তাঁর কোনো কুণ্ঠা হয়নি। তাঁর লেখা 'ত্রয়ী' হতে সেই কথোপকথন তুলে দিচ্ছি:

গর্কি- রাশিয়ায় আর কি তোমার ভালো লাগেনি?

সৌম্যেন্দ্রনাথ - মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে মেরে ধরে সংকুচিত করে সরকারী মতবাদের ফ্রেমের মধ্যে বাঁধবার জন্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বর্তমান নেতারা লেনিনের নামের যে মর্মান্তিক অপব্যবহার করছেন সেটা আমার মনকে খুবই পীড়া দিয়েছে। প্রত্যেকটি চিন্তা প্রত্যেকটি মতবাদের বিচার হওয়া উচিত তার নিজস্ব মূল্যে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সেই বিচারের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যখনই কেউ কিছু বলে কিংবা লেখে অমনি সে বিষয়ে লেনিন কি বলেছেন সেইটে খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে লেগে পড়ে বড়ো ক্ষুদে মাঝারি টীকাকারের দল। যদি লেখক বা বক্তা ভাগ্যক্রমে সমর্থন পায় লেনিনের লেখা থেকে তবেই সে বাঁচে, নইলে তার দুর্দশার সীমা থাকে না। এইরকম করেই স্বাধীন চিন্তার ভ্রূণ হত্যা বহু যুগ হতে করে এসেছে ধর্মের পদ্ধতি পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের ও শাস্ত্রকারের দোহাই দিয়ে। সেই একই হত্যাকাণ্ড চলছে সোভিয়েট রাশিয়ায় লেনিনকে শাস্ত্রকার আর লেনিনের লেখাকে শাস্ত্র বানিয়ে।

গর্কি - তবুও বিচার করতে গেলে একটা কিছু তো প্রামাণ্য বলে ধরে নিতে হবে, নইলে

মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে কি করে?

সৌম্যেন্দ্রনাথ - প্রামাণ্য আমি স্বীকার করি, তবে সে প্রামাণ্য আমার চিন্তাকে, আমার মননশক্তিকে খর্ব করে দেওয়ার জন্যে নয়, আমার সৃজনীশক্তি সন্দীপিত করবার জন্যে। প্রামাণ্য মুগুর নয় মানুষকে ভয় দেখিয়ে হতবুদ্ধি করার জন্যে, প্রামাণ্য হচ্ছে আলো- পথ দেখাবার জন্যে। আপনাকে আর আপনার সৃষ্টিকে যাচিয়ে নেবে মানুষ সেই আলোতে। তাছাড়া এটা ভুললে চলবে না যে অতীতের কত অটল সিদ্ধান্ত টলে গেছে, যা একদা অনড় বলে মনে হয়েছে তা নড়েছে, ধুলোয় মিশেছে, মানুষ নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছে। মানুষের বিচারবুদ্ধিকে তার সৃজনীশক্তিকে আমি কোন প্রামাণ্যের পায়ে বলি দিতে রাজী নই। এছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ায় এক নতুন ধরণের পেট্রিয়টিজম্ গজিয়ে ওঠেছে সেটাও আমি বরদাস্ত করতে পারিনে। -

গর্কি- কি রকম পেট্রিয়টিজম্?

সৌম্যেন্দ্রনাথ- কবিতা শিল্প থেকে খাবার পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ায় যা কিছু তৈরী হচ্ছে, তার মত আর দুনিয়ায় কোথাও কিছু নেই, এই উৎকট পেট্রিয়টিজম্ এর গুটিতে সোভিয়েট নাগরিকের দেহ ভরে গেছে। মস্কোয় এক রুশীয় বন্ধু আমায় জিজ্ঞেস করলেন, রুশীয় রান্না কেমন লাগছে? বল্লুম, মন্দ নয় তবে আহামরি কিছু নয়। বন্ধু খাপ্পা হয়ে উঠলেন। সে কি! রুশীয় রান্নার মত এমন রান্না দুনিয়ায় আছে? সাহিত্য আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন, সোভিয়েট যুগের রুশীয় সাহিত্যে কিছু পড়েছি কিনা। বল্লম হ্যাঁ পড়েছি কিছু কিছু যেমন গ্লাডকফ্, ত্রিচিকফ্, ডিমিয়ান বিয়েদিন প্রভৃতি। ডিমিয়ান বিয়েদির কবিতা পড়েছি শুনে বন্ধু খুশী হলেন, বল্লেন চমৎকার কবিতা লেখেন বিয়েদিন, নিশ্চয়ই তোমার খুব ভালো লেগেছে তাঁর কবিতা? কত আর মিথ্যে বলা যায়; তাই মরিয়া হয়ে বল্লম, আদবেই ভালো লাগেনি বিয়েদির কবিতা- ওগুলো কবিতাই নয় ওগুলো ইস্তাহার, ওতে না আছে ভাব না আছে রস।' আর যায় কোথা। সেদিন তপ্তবাক্যের যে লাভাস্রোত বন্ধুর ওষ্ঠ থেকে নির্গত হলো তাতে একবারে দগ্ধ হয়ে বাড়ী ফিরলুম।

গর্কি হাসতে লাগলেন। বড় মিষ্টি লাগলো তাঁর হাসি। মানুষের প্রতি গভীর দরদ সেই হাসিতে মাখানো ছিল।'

তাঁর জীবনের মূল সুরই ছিল সংগ্রামের সুর। মানুষের অধিকার কোথাও খর্ব হচ্ছে কিংবা কেউ মানুষের জীবন নিয়ে ডিপ্লোমেসি বা রাজনীতি করছে এ তিনি আদৌ সহ্য করতে পারতেন না। তাই বিশ্বরাজনীতির আসরে হিউম্যানিস্ট সেজে, যারা মানবতার বুলি আওড়ায় সেইসব ঝুটা মানবতাবাদীদের উদ্দেশে তাঁর সাবধান বাণী

'Humanists without humanism beware! Millions [of] eyes are watching you. You are on trial!' (Treacherous Marsh)

4নং এলগিন রোড
কলিকাতা-20
1লা বৈশাখ, 1365
শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন,
আপনার কার্ড পেয়ে আমার মনে হলো যে হয়ত বা আমি পরিষ্কার করে আমার বক্তব্যটি বলতে পারিনি আমার আগের চিঠিতে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক হিন্দুয়ানি দানা বেঁধে উঠেছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, কিন্তু আমার মতে এর জন্যে পরমহংসদেব দায়ী নন দায়ী স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী। পরমহংসদেবকে নিয়ে Neo-Hinduism এর revivalism এর সূত্রপাত করেন বিবেকানন্দ। আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে স্বামীজীই বাংলাদেশের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন কালীঘাটের দিকে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যে বিচারশীলতা ও যুক্তিবাদের ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন আমাদের দেশে তার স্রোত রুদ্ধ করে দেন বিবেকানন্দ Neo-Hinduism এর বালির বাঁধ খাড়া করে।

স্বামীজী সম্পূর্ণ split personality, তাঁর উক্তিগুলি contradiction-এ ভরা। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মূর্তিপূজা মিলোবার অসাধ্য প্রয়াস করেছেন। যে অলস মনগুলো রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ধাক্কায় জেগে উঠছিলো, ভিতরে ভিতরে অসোয়াস্তি বোধ করছিলো সেগুলোকে তিনি আশ্বাস দিলেন যে ঘেঁটু পূজার মধ্যেও সত্য আছে। অজ্ঞানরা এই আশ্বাস পেয়ে যতো মত ততো পথ- আবার নিশ্চিত হয়ে ঘুমোতে লাগলো।

পরমহংসদেবের মুখে যতো মত ততো পথ- Universalism এর বাণী, পৌরাণিক হিন্দুধর্মের গালে চড়ের নামান্তর। ওটা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সত্যের একচেটিয়া দাবীর অধিকারকে অস্বীকার করা। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে যাঁর বিশ্বাস, তাঁর পক্ষে ইসলামীয় পন্থা, খৃষ্টান পন্থা গ্রহণ খুব সহজ নয়। একটা বিরাট catholicity-র পরিচয় পাই, পরমহংসদেবের মুখের ‘যতো মত ততো পথ’ এর মধ্যে। ওটা তাঁর পক্ষে realisation-এর কথা, সত্যসন্ধানীর ব্যাকুলতার পরিচয়। কিন্তু ঐ একই কথা বিবেকানন্দ প্রভৃতির মুখে ঘোর মিথ্যে। কেননা তাঁদের মুখে এই কথাটা সম্পূর্ণ intellectual sphere-এর কথা। আর intellectual sphere এ ‘যতো মত ততো পথ’ কথাটি একেবারে ভুল কথা, বাজে কথা। সব মত পথ নয়, অনেক মত অপথ ও কুপথ। তাই পথ বলতে যদি সত্যের পথ বোঝায়, তাহলে সব মত সত্যের পথ নয়, হতে পারে না। রামকৃষ্ণ পরমহংস যেহেতু ঐ কথাগুলি intellectual sphere থেকে বলেন নি, নিছক সত্যকে পাবার ব্যাকুলতা থেকে বলেছিলেন, আর সেই ব্যাকুলতায় পৌরাণিক হিন্দুয়ানির গোঁড়ামিকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন, সেই কারণে তাঁর মুখে ঐ কথাগুলির অর্থ সম্পূর্ণ যথার্থ। মতলববাজদের মুখে ঐ কথাগুলি সম্পূর্ণ ঝুটো। বিবেকানন্দ সাংঘাতিক ক্ষতি করেছেন আমাদের। তিনি রথের যাত্রাটাকে উল্টো

রথের যাত্রা করে দিয়ে চলে গেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে গেছেন বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে কিছু লেখবার ইচ্ছা আছে। জানি না এবারেও আমার কথাটা পরিষ্কার করতে পারলুম কিনা। আপনি খুবই শক্ত কাজ হাতে নিয়েছেন। এ কাজে আপনি সফল হোন। তবে ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যতোটা আইডিয়ার বিরুদ্ধে বলা যায় ততোই ভালো। ইতি।

ভবদীয়

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আউধগর্বী

বারাণসী

25 শে বৈশাখ, 1365

শ্রদ্ধেয়,

আপনার পত্র আসার আগেই আমি কাশী চলে এসেছি বিশেষ কাজে। যে ‘শক্ত কাজে হাত’ দেওয়া হয়েছে তারই ফলে এই গরমে কিছুদিন কাশীতে আসতে বাধ্য হলাম। বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভৃতি যে অগ্রগতির ‘রথ যাত্রাকে উল্টোরথের’ যাত্রা করে দিয়ে গেছেন, আপনার এই সুচিন্তিত অভিমত আমার অন্তরে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে।

বিবেকানন্দের split personality সম্বন্ধে আপনার সাথে আমি একমত। ইষ্টকে ধ্যান করতে গিয়ে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের দুঃখজর্জর রোগক্লিষ্ট অভাবশীর্ণ রূপটির ছবি যাঁর সামনে নাকি প্রতিভাসিত হয়ে উঠত, ‘স্বজাতি-নিন্দিত বিজাতি-বিজিত এই হতভাগ্য জাতটার প্রতি মমতায় যাঁর নাকি আকুলতার অন্তঃ ছিল না, তাঁকেই আবার মঠমিশনের প্রচার প্রতিষ্ঠার খাতিরে তাঁর দেশবাসীকে পীড়নকারী সেই বিদেশী ধনীদের কাছে হাত বাড়াতে দেখি, অথচ ঐ মঠ মিশনের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদেরও তাঁর বিরাম ছিল না; কায়েমী স্বার্থসন্ধানীদের মতলবী প্রচারের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের দলভারীর কাজেও তিনি সহায় হয়েছিলেন। আচার-আচরণে, কথায়-বক্তৃতায় এবং উদ্দেশ্য-উপায়ের মধ্যে তাঁর পরস্পর বিরোধী মনোবৃত্তি, এই অসঙ্গতি, এই contradiction ক্ষণে ক্ষণেই ফুটে উঠেছে; জাতির এ এক চরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের পথিকৃৎ যিনি, এই কর্মনাশা সর্বনাশা যজ্ঞের প্রধান হোতা সেই ‘সরল সত্যনিষ্ঠ নিরীহ সাধু’ রামকৃষ্ণকেও ইতিহাস কখনও ক্ষমা করতে পারে না এবং এইখানেই আপনার সঙ্গে আমার difference of opinion হচ্ছে। আপনি বিবেকানন্দকে যে পরিমাণে দোষী করেছেন, আমি রামকৃষ্ণকেও সমভাবে দোষী বলে ভাবি। ‘সরল সত্যনিষ্ঠ’ ছিলেন বলে, সত্যলাভের জন্য ব্যাকুলতা তাঁর ছিল বলে আপনি রামকৃষ্ণের দোষকে লঘু করে দেখতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু দয়া করে ভেবে দেখুন, দেশকে ঘেটু পুজো আর কালীঘাট মুখো করার, আবার একই

কণ্ঠে অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ববিলাস করার জগাখিচুড়ি শিক্ষা বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের কাছেই পেয়েছিলেন। তাই আমার মতে রামকৃষ্ণেরই দায়দায়িত্ব বেশী, বিবেকানন্দ তাঁর প্রধান সহায় দোসরমাত্র। রামকৃষ্ণের Realisation যে perfect realisation নয়, অন্যান্য সন্ত মহাপুরুষদের উচ্চতম অধ্যাত্ম অনুভূতির তুলনায় যে তা নিম্নস্তরের তা আমি আমার বই-এ আলোচনা করেছি। তাঁর সত্যলাভের ব্যাকুলতাকে অনেক সময় আমার লব্ধভূমিকত্বের অভাবে মত হতে মতান্তরে ছুটে বেড়ানোর প্রয়াস বলে মনে হয়েছে।

বিবেকানন্দের split personality সম্পূর্ণ স্বীকার করি। কিন্তু বিবেকানন্দ নামক ব্যক্তিটির মাঝে যে সমস্ত অফুরন্ত উপাদান ছিল তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করা যায় না সেগুলোর অপরিমেয় সম্ভাবনাকে। 'Sceptic child' নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বৈচিত্র্যের যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল তাকে বিরোধে রূপান্তরিত করে অসঙ্গতিতে ভরিয়ে তোলার পেছনে মূলতঃ দায়ী কে? ঐ প্রচণ্ড প্রাণশক্তিকে বহুদিনের পুরাণো পচা স্রোতহীন এক অপরিসর খালের কুসংস্কার আর ভ্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের মোহে গতিরুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী আমরা কাকে করবো? একদিকে নিজের প্রাণশক্তির দুর্বার গতি, তৎকালীন দেশ বিদেশের বৈপ্লবিক ভাবধারার সংঘাত আর অপরদিকে গুরুর সেই সব ভালোভাব, সেই পাথরপূজা বহিরাচার ভক্তিগদগদ ভাববিলাস 'যত মতো ততো পথ' নামে বিচিত্র আপোষ সেই Theocrasia-এই দোটানার মাঝে বিবেকানন্দ পথ হারিয়ে, নিজের জ্ঞানবিচারের মুখে পাথরচাপা দিয়ে গুরুর psychic power এর কাছে মাথা নত করেছেন। তাই বিবেকানন্দকে সমালোচনার আগে আজ রামকৃষ্ণের প্রকৃত মূল্য নিরূপণই প্রধান প্রয়োজন। খাদমিশানো খণ্ড খণ্ড সোনার টুকরো দিয়ে সুন্দর অলঙ্কার গড়া যায় আর প্রকৃত শিল্পীর কৃতিত্বও সেইখানে। সত্যকে লাভকরার জন্য রামকৃষ্ণের হয়ত ব্যাকুলতা ছিল, কিন্তু সত্য সম্বন্ধে তাঁর কোনো সঠিক জ্ঞান না থাকায় পথে বিপথে মাথা ঠুকেছেন তাঁর সঠিক realisation হয় নি।

রামকৃষ্ণ নাকি ভাবদৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন যে বিবেকানন্দ হলেন 'অখণ্ডমণ্ডলের দিব্যজ্যোতিঘনতনু সপ্তর্ষির অন্যতম'। বিবেকানন্দের উপর রামকৃষ্ণের সদাসতর্ক দৃষ্টিও ছিল, তাঁকে তাহলে ঠিক পথে চালিত করার চেষ্টাও তিনি সাধ্যমত অবশ্যই করেছিলেন একথা ধরে নেওয়া যায়। কাজে কর্মে, স্থানে অস্থানে বিবেকানন্দের চোখের সামনে গুরুর মূর্তি ভেসে উঠার, গুরুর আদেশবাণী ধ্বনিত হওয়ার অনেক কাহিনীই প্রচলিত আছে। তা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ ব্যর্থ হলেন; জাতির কাছে, সমাজের কাছে তাঁর দান Negative-মুখী হয়ে রইল। কিন্তু কেন? এটা রামকৃষ্ণের অক্ষমতা বা অজ্ঞানতা নয়? এবং তা যদি হয়, তাহলে তাঁর যে সত্যিকার কোনো spiritual Realisation ছিল না অন্তত perfect নয়-একথা স্বীকার করতেই হয়। আর যদি ধরে নিই যে তাঁর spiritual Realisation ছিল তাহলে কি তিনি ইচ্ছে করেই, কারণে অকারণে প্রশংসা করে তাঁর সবকিছুতিই support করে সব কিছুতেই

indulgence দিয়ে যাঁর কার্যকলাপ পরে জাতিকে negative পথে পরিচালিত করবে তাঁর সেই ‘সহস্রদলপদ্ম’ নরেনের আচার আচরণ তিনি কেবল শিশুর সারল্যে চোখ বুজেই উপেক্ষা করে গেছেন? কিন্তু তাঁর মত ‘সরল মূর্খ’ মানুষ কোনো motive নিয়ে এসব করে গেছেন- এ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই ব্যাকুলতা সত্ত্বেও তিনি যে সত্যলাভ করতে পারেন নি, এই আমার ধারণা। ধূলিমুষ্টিকে স্বর্ণমুষ্টি ভেবে তিনি আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ আমাদের ঠকিয়েছেন। সর্ব ধর্ম পরীক্ষার যে ব্যর্থ প্রহসন, সে সবকে তিনি মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে ভাবগৌরবে মণ্ডিত করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের কানে এই ‘সবভালোর’ বাণী বড়ই মধুর শুনিয়েছে তাই প্রচাৰ প্রতিষ্ঠার মোহে, কয়েকজন বিশিষ্ট পূজা সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কাছে, কোলকাতার ‘ইংরেজী জানা বাবুদের’ কাছে অপ্রত্যাশিত শ্রদ্ধা পূজা সম্মান পেয়ে তিনি মাথা ঘুলিয়ে ফেলেছেন। তাই জ্ঞানের অপরিপক্ক অবস্থায় এক common patent mixture আবিষ্কার করে গেছলেন, আর সেই দাওয়াই এর প্রশংসাপত্র পাওয়া গেল বিবেকানন্দ বিদেশে জয়ঢাক পিটিয়ে আসার পর। নিজেকে অবতার বানাবার আর পরবর্তী অনুচরদের কায়েমী গদী অটুট রাখার এ এক মোক্ষম ব্যবস্থা হল। রামকৃষ্ণকে কেউ ‘অবতার’ বললে, ‘পূর্ণ ভগবান’ বললে যে তিনি খুশী হতেন এর প্রমাণ আমি আলোক-তীর্থে দিয়েছি। সর্বধর্মের সমন্বয়সাধক বলে যাঁর এত খ্যাতি সেই রামকৃষ্ণই কিন্তু আবার মধুসূদনকে বিধর্মী বলে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন; জন্মদোষে দুষ্ট বলে নিরপরাধ যুবককে দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর বসার স্থানের মাটি পর্যন্ত কোদাল দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, সর্বভূতে মাতৃমূর্তি দ্রষ্টার এ কি বিচিত্র বিভ্রম। এমনতরো হাজারো অসঙ্গতিতে রামকৃষ্ণের আচার আচরণ পরিপূর্ণ। সেগুলোকে ‘পরমপুরুষের’ নিছক লীলা জ্ঞানে উড়িয়ে দিতে না পারলে রামকৃষ্ণকেও split personality বলে অভিহিত করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই বিবেকানন্দ intellectual sphere থেকে বলেছেন আর রামকৃষ্ণ spiritual Realisation থেকে বলেছেন বলে রামকৃষ্ণের দায়িত্ব খালাস একথা মানা আমার পক্ষে কঠিন।

মাটি পাথর, ঘেঁটু পুজো, বারব্রত অনুষ্ঠান, ব্রতকথা শুনে আমলকী বৃক্ষের সিদ্ধিদায়কত্ব এবং গঙ্গাজলের মোক্ষদায়িকা শক্তি সবকিছুকেই রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন। বৃহস্পতিবারের বারবেলা থেকে আরম্ভ করে ত্র্যহস্পর্শ, মঘা, পুষ্কর, কবচ-মাদুলী সবকিছুতেই রামকৃষ্ণের বিশ্বাস আমরণ অটুটু ছিলো তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কাজেই একটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ বাড়ির ছেলে পুরোহিত তন্ত্রের ভুল বিধানে তৎকালীন সমাজে অপাঙ্ক্তেয় মাহিষ্য বাড়িতে পূজারী হয়ে এসেছেন বা হিন্দু আচার উপেক্ষা করে ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন এগুলো, ‘পৌরাণিক হিন্দুধর্মের গালে চড়ের নামান্তর’ নয়, এর মধ্যে কোনো catholicity নেই। উদারপ্রাণ বিশালধী সৌম্যেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক চেতনা এবং catholicity-ই এগুলোতে নিজের মনের প্রতিভাস আরোপ করেছেন।

সাধনপথের সেইখানেই ‘যতো মত ততো পথ’ নীতি গ্রহণযোগ্য নয় একথা আপনিও স্বীকার করেছেন। যা সত্য নয় ঊর্ধ্বতর sphere এ তা আরও বেশী স্পষ্ট করে ধরা পড়ার কথা। Lower Region এ পথ অনেকগুলো পথ ভুল হতে পারে কিন্তু Higher spiritual plane এ যেখানে পথ একটাতে এসে শেষ হয়, পরিণতি লাভ করে এক নির্বিশেষ পরমতত্ত্বে সেই উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে ‘হিরণ্ময়ে পরে কোষে’ অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের আলোয় ‘যতো মত ততো পথ’ বলা আরও বেশী ভ্রান্তি। হয় লব্ধভূমিকত্বের অভাব নয়ত অভিসন্ধিমূলক রচনা।

প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখি ব্যক্তির সাথে বিরোধে আমারও রুচি নেই, ‘Idea’-র বিরুদ্ধেই সংগ্রাম আমার, সংগ্রাম আমার মিথ্যার বিরুদ্ধে। কিন্তু যেখানে সমাজজীবনে জাতির মানসচেতনায় idea এর চেয়ে ব্যক্তির প্রভাবই বেশী দেখি, সেখানে ব্যক্তিকে অক্ষত রেখে idea নিয়েই নাড়াচাড়া করলে তার ফল খুব বেশী effective হবে কি? এই ব্যক্তিপূজার দেশে, ব্যক্তির প্রভাব আমাদের মনের গোপন কোণে এমনই এক তীব্র কোমল মায়া বিছিয়ে রাখে যে সেখানে হাত পড়লেই সাধারণে বেদনায় অধীর হয়ে ওঠে। মনে ভাবে তার শ্রদ্ধা গেলে বুঝি সেও গেল। idea কে ভালোবেসে লোকে photo পূজা করে না, photo পূজা করে ঐ idea এর আধার ব্যক্তির মোহে পড়ে। তাই সমাজজীবনের ঘুণধরা পঙ্গুদেহে সত্যিই যদি আবার নূতন করে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করতে হয় তাহলে ঐ মূল ধরেই নাড়া দিতে হবে। Idea সহ ব্যক্তিকেও নিয়ে সমালোচনা তাই প্রয়োজন আছে। তবে আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে idea নিয়ে বিশ্লেষণ করাই সবদিক দিয়ে শোভন এবং নিরাপদ।

সমালোচনায় হয়ত বা তিক্ত ও কঠোর হয়ে পড়েছি। কিন্তু এ আমার ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগার প্রশ্ন নয়; সত্য প্রতিষ্ঠার বাধা জঞ্জাল সরাতে গেলে নির্মম হতেই হবে।

আপনার পূর্ব পূর্ব পত্রে চিন্তার গভীরতা এবং মৌলিক দৃষ্টিকোণের ঈপ্সিত ইঙ্গিত পাওয়ার পর থেকে আপনার উপর অনুযোগ জমা হচ্ছিল। দেশের জনমানসে আপনার লেখার প্রভাবও প্রচুর। তবু এতদিন এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি কেন? আপনি এ সম্বন্ধে কিছু লিখবেন জেনে আশ্বস্ত হলাম।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে।
বিনীত
শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল
4নং এলগিন রোড কলি-20
10ই জ্যৈষ্ঠ, 1365

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,
কাশী থেকে লেখা আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। কাজের ঘূর্ণিতে

দিশেহারা হয়ে থাকি তাই উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেলো। আপনার চিঠি পড়ে মনে হলো আমি বোধ হয় আমার কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারছি না। হতেও পরে আমার নিজের মনের মধ্যে কোথাও একটা জট থেকে গেছে সেটা ছাড়াতে পারছি নে, তাই সব তালগোল পাকিয়ে গেছে, পরিষ্কার করে ধরে দিতে পারছি নে। তবুও আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে আমার ধারণা যে তিনি সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ও ভগবৎ ব্যাকুলতা ও পিপাসা তাঁর অন্তরে ছিলো অসীম। আমি যখন তাঁকে আধ্যাত্মিক লোক বলি তখন তাঁর এই নিখাদ ভগবৎ ব্যাকুলতা ও পিপাসার কথা মনে করে বলি।

যিনি উপলব্ধির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত তিনি যেমন আধ্যাত্মিক, আমার মতে যে মানুষ সমস্ত প্রাণ দিয়ে উপলব্ধির জন্যে চেষ্টা করছেন তিনিও আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আত্মিক গঠন আছে। সেই আত্মিক গঠনটি যদি ধরতে পারা যায় তো সেই মানুষটিকে তখন ঠিকভাবে বোঝা যায়। সেই মূল আত্মিক মানসিক গঠনের সঙ্গে অন্য অন্য শক্তির প্রকাশও এসে মেশে, কিন্তু আসল গঠনটি এদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না, অবগুণ্ঠিত হয় না। এটার সঙ্গে তুলনা চলে রাগ রাগিণীর গঠনের। প্রত্যেক রাগের একটা মূল গঠন, মূল প্রকৃতি আছে, মূল স্বরবিন্যাস আছে। তারপরে তানের মধ্যে অন্যসুরের খেলা আছে, কিন্তু তান রাগের মূল গঠনকে অতিক্রম করে না, লঙ্ঘন করে না। এই মূল স্বরবিন্যাসের দ্বারা প্রতিটি রাগ স্বতন্ত্রতা, স্বকীয়তা লাভ করে। তেমনি প্রতিটি মানুষের একটি মূল সুর আছে। পরমহংসদেবের মূল সুরটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক। যেমন স্বামী বিবেকানন্দের মূল সুর হচ্ছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সুর, যদিও পরে জ্ঞান পাঁচমিশেলিতে ঘোলাটে হয়ে গেলো, তিনি প্রজ্ঞার শিখরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেন না। পরমহংসদেব উপলব্ধির শিখরে প্রতিষ্ঠিত উদ্ভাসিত চৈতন্য-পুরুষ নন। তাহলে অদ্বৈতবাদের পরে আবার কালীর উপাসনা করতে পারতেন না। সেটা কখনো সম্ভব হতো না। পিপাসাটা আন্তরিক, জ্ঞান নেই, প্রজ্ঞা তো নেই-ই। তাই এই হাতড়ে ফেরার শেষ নেই। কখনো যোগেশ্বরীর দ্বারা প্রভাবান্বিত, কখনো তোতাপুরীর দ্বারা, কখনো কেশবচন্দ্রের দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত। অবিশ্যি মঠের লোকেরা এ কথা শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন, কেন না তাঁরা ইতিহাসকে বিকৃত করে, সত্যের মুখে প্রচারের গোময় লেপন করে প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ পরমহংসকে গুরু ও অবতার বলে মেনেছিলেন। এটি সর্বৈব মিথ্যা কথা। দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও দুজনেই দুজনের সঙ্গলাভে উপকৃত হয়েছিলেন। পরমহংসদেব মূর্তিপুজো থেকে সরে যাচ্ছিলেন কেশবচন্দ্রের প্রভাবে। এর প্রমাণ আছে।

যাই হোক পরমহংসদেব আধ্যাত্মিক গঠনের পুরুষ, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বৌদ্ধিক গঠনের মানুষ। আমি স্বামীজীকে

আধ্যাত্মিক গঠনের মানুষ বলে মনে করি নে অর্থাৎ তাঁর মূল সুরটি আধ্যাত্মিক নয়, বুদ্ধির সুর, সেই সুরের সঙ্গে তালের

কাজে আধ্যাত্মিক সুর এসে লেগেছে। পরে বুদ্ধির জায়গাতেও খাদ এসে মিশেছে। তাই অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ঘেঁটুপুজো মেলাবার অসম্ভব চেষ্টা! ‘বুদ্ধদেবের দাসানুদাস’ বলে নিজেকে অভিহিত করবার পর কালী সেবকের ভক্ত বলে নিজেকে প্রচার করা, রামমোহনকে এযুগের শ্রেষ্ঠপুরুষ বলার পর রামমোহনের সমস্ত ধারণার বিপরীত মতগুলিকে সজোরে (আর তাঁর জোর প্রচণ্ড।) প্রচার করা এসব পরস্পর বিরুদ্ধ ধারণাগুলিকে নিয়ে থেতলে মেশানোর প্রয়াস বিবেকানন্দ করেছেন। তাঁর মধ্যে দুটি খণ্ড চেতনার ঝুটোপুটি হুরুদ্দুম লেগেই আছে। তাই এতো শক্তি ব্যর্থ হলো! স্বামীজী সত্য অর্থে, বিরাট অর্থে tragic পুরুষ। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে tragedy-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। জানি না, এবারেও বোঝাতে পারলুম কিনা। নানা ভাব ও চিন্তা মনের ভিতর থেকে ঠেলে বের হতে চায়। কলম তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। আমিও নাকাল তাদের হাতে।

আজ তমলুক যাচ্ছি, কাল ফিরবো। আশা করি ভালো আছেন। আমি ভালোই, তবে ক্লান্ত।

প্রীতি-নমস্কার জানবেন।

ভবদীয়
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বারাণসী

18ই জ্যৈষ্ঠ, 1365
শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমীপেষু,
শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনি ঠিকই লিখেছেন- ‘ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে স্বামীজী একজন বিরাট Tragic পুরুষ।’ অথচ বলিষ্ঠ পৌরুষ ক্ষুরধার বুদ্ধি, দেশাত্মবোধ, আরও কতো মহৎ সম্ভাবনাই না তাঁর মধ্যে ছিলো। স্বামীজী অন্য কোনো Motive নিয়ে প্রথমে রামকৃষ্ণের কাছে আসেন নি- রামকৃষ্ণকে মহাপুরুষ জ্ঞানে, নিজে পূর্ণত্ব অর্জনের জন্যই তাঁর কাছে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। আজ বড় ক্ষোভের সঙ্গে ভাবি, রামকৃষ্ণের কাছে না এলে ঐ বিরাট ব্যক্তিটির সাধনা ও সংগ্রামের মধ্যে ব্যক্তি, সমাজ, যুগচেতনা এবং সমকালীন ইতিহাস এক অখণ্ড তাৎপর্যে বিধৃত হয়ে থাকতে পারতো।

আমি ‘সরল’ বলতে একটা মুক্তপ্রাণের ঔদার্য বুঝি। Simple এবং Simpleton এ প্রভেদ অনেক। বালকের সারল্য আর বালকের মতো ভান করে ‘বালকামি’ এ দুটোরও আমি প্রভেদ স্বীকার করি। কারও বাড়ীতে গিয়ে চোখ উল্টিয়ে শিশুর আধো আধো বুলিতে ‘জিলিপি খাবো’ বলা আর তার পরক্ষণেই দক্ষিণেশ্বরে ফেরার সময় ‘কিরে হৃদু ব্যাটা গাড়ীভাড়াটা দিয়েছে ত? এ সব ঢং এর মধ্যেও প্রভেদ আছে। গান শুনতে শুনতে উলঙ্গ হয়ে কাপড় বগলে করা আর পরক্ষণেই নবাগতদের কে কে নাসিকা বা ভ্রূকুঞ্চিত করছে, তার জন্য ক্ষুণ্ণ হওয়া এ দুটোই কি শিশুর সারল্য?

পরমহংসদেবের শিশুসুলভ সারল্য এবং 'মা মা' বলে কালীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ ফোটাতে গিয়ে ছায়ানট গুরুদাস ছায়াচিত্রে যে 'বালকামি' ফুটিয়ে তোলেন তা এক অর্থে যথাযথ এবং সার্থক বটে! সত্যলাভের জন্য এক গুরু হতে অন্য গুরুর কাছে ছোটা, প্রত্যেক গুরুর নির্দিষ্ট পন্থায় সাধন করে নিজেকে পূর্ণকাম ভাবা, আবার অন্য গুরু এলে তাঁর কাছে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে সাধন করতে লেগে যাওয়া, যোগেশ্বরী যখন 'অবতার' বলে প্রমাণ করলেন তখন উল্লসিত হওয়া, পরে তোতাপুরীর কাছে নিজের অপূর্ণতা বুঝতে পেরে পুনরায় infant class থেকে শুরু করা, এগুলোর মধ্যে আর যিনি যাই খুঁজে পান না কেন

আমি এই এক একটা ব্যক্তির প্রভাবে ঝড়ের মুখে কুটো পাতার মতো উড়ে যাওয়াকে অস্থির চিত্ততা, এবং অত্যন্ত ভাবতারল্য বলে মনে করি। আলোক-তীর্থে একেই আমি 'লব্ধভূমিকত্বের অভাব' এবং 'Reductio ad-absurdum of all religious values and Religions Loyalties' বলে উল্লেখ করেছি। -

রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক গঠনের মানুষ ছিলেন আপনার এই অভিমত নিম্নলিখিত কারণে গ্রহণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত -

(1) আমার মতে, সত্যলাভের ব্যাকুলতা সত্য সত্যই যদি কারও অন্তহীন এবং genuine হয় তাহলে সত্যলাভে বাধা থাকে না, সত্যসন্ধানীকে সত্যই রক্ষা করেন। কেউ যদি ধূলিমুষ্টিকেই স্বর্ণমুষ্টি ভেবে নির্বোধের মতো উল্লসিত না হয় বা সাধনার মাঝপথে মান-প্রতিষ্ঠার কুহকে পড়ে 'মায়ের কাছে চাপরাশ পেয়েছি' বলে গুরু সেজে না বসেন, তা হলে সত্যলাভতাঁর হবেই। পরমেশ্বর জানেন কোন্ জীবের হৃদয়ে আবাহনী সুর ধ্বনিতে হচ্ছে। আকুলিবিকুলি থাকলে যোগাযোগ ঘটে যায়। সেই জীবন-মহাশিল্পীর দিব্য বিধানে কোনো অনিয়ম বা ছন্দোপতন দেখা যায় না।

(2) আপনি যে অর্থে আধ্যাত্মিক বলেছেন তা হয়ত ঠিক, কিন্তু আমি আধ্যাত্মিক আত্মার অধিরোহণ, একটা প্রজ্ঞাদীপ্ত মহাচেতন সমুখানকে বুঝি। অর্থাৎ আমার মতে, আত্মিক গঠন আধ্যাত্মিক হয়, তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞাহৃত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমূহ দিব্য উপাদান Latent থাকে এবং তা এক অন্তর্গূঢ় চৈতন্যশক্তির উৎসমুখী স্ফুরণে বিকশিত হয়-ই।

(3) ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ত্রিভুবনরূপ জগন্মণ্ডলকে কোশরূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেই কোশই 'বসুধান' অর্থাৎ প্রাণিগণের কর্মফল তাতে নিহিত থাকে। জীবের অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত কর্মের যে সব অনুভূতির ছাপ পড়ে, সেইগুলির নাম সংস্কার এবং এইসব সূক্ষ্ম সংস্কারের আধারের নাম কর্মাশয় বা বসুধান। এই 'বসুধান' থেকেই প্রত্যেকের কর্ম, আচরণ, জীবনচর্যা নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, এই হল ঋষিদের অভিমত। রামকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম, স্বপ্ন-সাধনা, কুপথে বিপথে ছোটাছুটি, সাধনার নামে জড় মাটি, কাঠ, পাথরের পূজায় প্রবৃত্তি, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্ররোচনায় সানন্দে নরমাংস ভক্ষণ, কুকুর শেয়ালের এঁটো খাওয়া, সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রা নারীর যোনিমন্থন, হনুমানের মতো কাঁচা ফল খাওয়া এবং বিঘূর্ণিত লোচনে শাখা-প্রশাখায়

লাফিয়ে বেড়ানো, নারীবেশে সেজে থাকা (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধক ভাব, ২য় খণ্ড, 103 পৃঃ, 119 পৃঃ 206 পৃঃ, 259 পৃঃ ইত্যাদি) কেশব সেন ও তোতাপুরীর শিক্ষাদীক্ষা পেয়েও পুনরায় জড় মাটি কাঠপাথরের পুতুল খেলায় আসক্তি, নানা বিরুদ্ধ উক্তি, নানা হিষ্টিরিক হাবভাবের প্রতি একটা Impulse সব কিছুকে বিচার করলে বোঝা যায়, রামকৃষ্ণের constitution এ কোনো আধ্যাত্মিকতা ছিল না, তাই পূর্ব জন্মের 'বসুধান' কর্মাশয় অনুযায়ীই তিনি অকাজ-কুকাজ, কুপথ-বিপথের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেয়েছেন মাত্র। প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দু বালকের মনে যে ধর্মের সংস্কার, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বোধ থাকে তদতিরিক্ত যদি কিছু তাঁর মধ্যে Latent থাকতো তবে তা potent হতোই- যেমন করে সবকিছু বাধা সরিয়ে ভূগর্ভ থেকেও একটি বীজ সূর্যমুখী হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

(4) যাঁর আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক হয়, তাঁর জীবন বুদ্ধের ভাষায় 'সোমং লোকং পভসেতি অব্‌ভা মুক্তো ব চন্দ্রিমা' - তিনি অভ্রমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীকে প্রভাসিত করেন। এই রকম জীবনে 'চরৈবেতি' মহামন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে; তাঁর নিজের জীবনেও যেমন শুভ্রনিরঞ্জন সত্যের প্রকাশ ঘটে তেমনি অন্যকেও অচির ও নাস্তির জগৎ হতে সুচির ও অস্তির জগতে উপনীত হওয়ার প্রেরণা দেন।

(5) রামকৃষ্ণের জীবনে যাই হোক একটা আকুলতা আমরা লক্ষ্য করেছি। ঐ আকুলতা সত্ত্বেও তবুও তিনি উপলব্ধিরই স্থির চিদ্-ভূমিতে স্থিতি লাভ করতে পারলেন না কেন? কেন তাঁর প্রভাব জাতির জীবনে Negative বা কালীঘাট মুখো হয়ে রইলো? ঋষিরা বলেছেন Purely spiritual Region অর্থাৎ সেই ভূমাময় অধ্যাত্মভূমি থেকে Centripetal Force এর মতো এক দুর্নিবার দিব্য আকর্ষণ সকলের জীবনকে কেন্দ্রের মুখে সদাই টানছে যাঁর আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক হয়, সেই মহৎজীবন এক দিব্য সমজাতীয় বস্তুর চৈতন্যময় আকর্ষণে অধ্যাত্মভূমিতে লব্ধভূমিকত্ব লাভ করেন। রামকৃষ্ণের জীবনে এর ব্যতিক্রম দেখি কেন?

(৬) একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন একটি পরিপূর্ণ সুন্দর art এর মতো। প্রত্যেক সত্যকার art হলো আমার মতে আত্মার প্রকাশ (Expression of the soul); তাই প্রত্যেক মহান শিল্প জীবনপ্রদ হয় (The art that gives life)। রামকৃষ্ণের জীবনকে যদি একটা art ধরি তাহলে এই art মোটেই জীবনপ্রদ হয়নি। আত্মিক গঠন কারও আধ্যাত্মিক হলে তা বাহ্যিক কর্মে ও সাধনাতে shadow of the soul, পরম সত্তার প্রজ্ঞাময় ছায়া অন্তঃশ্চৈতন্যের লীলাবিলাস, একটা চিন্ময় প্রতিফলন পড়বেই। কিন্তু হায় রামকৃষ্ণের জীবন এ জীবন শ্লথ, শিথিল, ছন্দোহীন, কতকগুলো নেতিবাচক কর্মের বিভ্রম লহর মাত্র।

(7) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দয়ানন্দ, যোগেশ্বর ত্রৈলঙ্গস্বামী এবং তোতাপুরী প্রভৃতি আলোক পুরুষদের সান্নিধ্যে গিয়েও রামকৃষ্ণ উদ্ভাসিত চৈতন্যপুরুষ হতে পারলেন না, এও এক Tragedy! একটি প্রজ্বলিত দীপ আর একটি দীপকে প্রজ্বলিত করতে পারে, কিন্তু প্রদীপে তেল না থাকলে? রামকৃষ্ণের

আত্মিক গঠন আধ্যাত্মিক ছিল না বলেই অনেক অধ্যাত্মপুরুষের সান্নিধ্যে তাঁর জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, দীপ জ্বললো না, হৃদয় কমল প্রস্ফুটিত হল না।

(৪) আত্মিক গঠন যাঁদের আধ্যাত্মিক ও প্রজ্ঞাদীপ্ত হয়, সে রকম দু'-চারজন আলোকসামান্য পুরুষের জীবনচর্যা সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সামনেই রয়েছে, আমরা এই ভারতেই তাঁদেরকে সহস্রদলে প্রস্ফুটিত এবং বিকশিত হতে দেখেছি। সমকালীন যুগ ও সমাজের পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সে সব ফুলকে শুকিয়ে ফেলতে পারে নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কবীর নানক প্রভৃতি সাধকরা অতি সামান্য ঘরেই জন্মেছিলেন, শিক্ষাদীক্ষা, আভিজাত্য বা ঐতিহ্য বলতে কিছুই তাঁদের ছিল না! তৎকালীন সমাজের গতিহীন আচার শৃঙ্খল অক্টোপাসের মতো তাঁদেরকেও নিষ্পেষণ করেছে, কিন্তু তবুও তাঁরা বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ঐ সব মহাপুরুষের বজ্রসার বাণীতে সত্য ও প্রজ্ঞা, তপস্যা ও কল্যাণের চিন্ময় প্রকাশ দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের এই পরমাসিদ্ধির প্রধান কারণ, তাদের আত্মিক গঠনটি ছিল মূলত আধ্যাত্মিক। বুদ্ধদেবের জীবনেও Feudalism তথা বুর্জোয়া পরিবেশের মিলিত চাপ ছিল অনেক বেশী। যে প্রতিষ্ঠা, সুখ ও সম্মানের প্রলোভন মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে, সেই অতুল ঐশ্বর্য ও বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়েও তিনি ব্যর্থ হন নি। তাঁর আত্মিক গঠনটি প্রকৃত আধ্যাত্মিক ছিলো বলে, ঊর্ধ্বের অভীপ্সা, শ্রেয়োলাভের আকুতি তাঁকে অধীর করে ছিলো। জীবের আর্ত ব্যর্থ জীবনের হাহাকার তাঁকে গৃহছাড়া করলো। কোনো বাধাই তাঁর আন্তর সাধনাকে বাধা দিতে পারলো না। মারের অর্থাৎ Negative power এর আক্রমণ তাঁকে আরও অদম্য, আরও সত্যলাভের জন্য উন্মুখ করে তুলেছিলো, মৃত্যুর বজ্রমুষ্টি হতে তিনি অমৃতের ভাণ্ড ছিনিয়ে এনেছিলেন, আপন বীর্যে তিনি বুদ্ধ হলেন। তাঁর প্রেম মৈত্রী করুণার বাণী দুর্গত পথহারাকে দিল সত্য পথের নির্দেশ।

সবাই জানেন, বটগাছের বীজ পাখীর দ্বারা চর্বিত হয়ে পাথরে পড়লে বহুদিন পরে তা অঙ্কুরিত হয়। এর কারণ কি? এর কারণ ঐ বীজের আন্তরসত্তায় এমন এক বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা থাকে যে, কোনো কিছুই তার গতিকে ব্যাহত করতে পারে না, তুলা বা মূলার বীজ হলে তা শুকিয়ে যেত। রামকৃষ্ণের জীবনকে আমার বটের বীজ বলে মনে হয় নি। মোটকথা, আমার ধারণা সেই মহান জীবন শিল্পী যাঁদের আত্মিক গঠনকে আধ্যাত্মিক করে পাঠান তাদের আত্মার অধিরোহণই হয়, জীবন সমুন্নতিতে শ্রেয়োলাভে বোধিলাভে তা ভাস্বর হয়ে ওঠে। নিম্নে যতই অন্ধকার ঘনিয়ে উঠুক, তিনি অন্ধকারের ওপারে ধ্রুবজ্যোতির সন্ধান পাবেনই। বাহিরের ঘনঘটা তাঁর অন্তরের সেই অনির্বাণ দীপ জ্যোতিকে কখনওই নিভিয়ে ফেলতে পারে না।

সেই যুগেরই যুগন্ধর পুরুষ রামমোহন বিদ্যাসাগরের জীবন দেখুন সমগ্র যুগচেতনা তাঁদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিলো। ধর্ম, সমাজচেতনা, রাষ্ট্রনীতি, সকল aspect এরই কী পরমাশ্চর্য প্রকাশ যা কিছু কুসংস্কার, যা কিছু জাতির পক্ষে আত্মক্ষয়ী সেগুলির বিরুদ্ধে তাঁদের কী দুর্জয় আপোষহীন সংগ্রাম। তাঁদের আত্মিক

গঠনটি বহ্নিময় প্রজ্ঞাময় ছিলো বলেই, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক মহাবিপ্লবের সেই বহ্নিবীজ কেমন সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছিল। তাঁদের জীবনে কোনো এলায়িত তেলায়িতভাব, কোনো তারল্য, কোনো বিভ্রান্তি, কোনো জড় উপাসনার বালাই ছিল না। পৌরাণিক অপধর্মের ঘূর্ণিপাকে যেখানে রামকৃষ্ণ ঘূর্ণমান, সেখানে তাঁরা বহুপূর্বেই ঐসব অপধর্ম এবং সামাজিক কদাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিবান হেনেছিলেন। তাঁরা সেই যুগের সেই উদ্যত ফণা আশীবিষকে দুরন্ত বালকের মতো বজ্রমুষ্টিতে ধরে, তার মস্তকের মণি কেড়ে নিয়েছিলেন। নিজেরা তার বিষদংশনে জর্জরিত হয়েও সেই মণি তুলে দিয়েছেন সকলের হাতে। আর সেই মণি বিচ্ছুরিত জ্যোতি পথহারা আত্মবিস্মৃত জাতিকে দিয়েছে আলোর সন্ধান। যুগধর্মের বশে, যুগোচিত প্রেরণায় এই রকম প্রতিভার বিকাশ হয়। এ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁদের আত্মিক গঠনটি প্রজ্ঞাময় ছিলো বলেই তাঁরা সেই যুগের দাবী-পূরণ করতে পেরেছিলেন। কামারপুকুর আর বীরসিংহের পারিপার্শ্বিক সেখানের বংশগত, সংস্কারগত তফাৎ-ই বা কতটুকু! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষা সংস্কারেও আচারে পুষ্ট হয়েও ভগবানের স্থানে মানুষকে বসিয়ে বিদ্যাসাগরের এই যে মানুষ পূজার প্রবৃত্তি, এই যে মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ ও জাতীয় জীবনের সবকিছু destructive element-এর বিরুদ্ধে তাঁর সেই যে বিদ্রোহ এর চেয়ে আশ্বর্যের আর কী থাকতে পারে!

আর অন্যদিকে রামকৃষ্ণের জীবন দেখুন তিনি যখন এলেন তখন রামমোহন, বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক চেষ্টায় যুগপ্রবৃত্তির সকল লক্ষণ একটা বৃহত্তর সার্থকতার পথে; ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্যসমাজের উদার বেদান্তধর্ম, সমগ্র জাতিকে 'চরৈবেতি' ও অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষা, বিদ্যাসাগরের মানবসেবা, রাজেন্দ্রলাল মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞানচর্চা, আচার্য কৃষ্ণকমলের নিরীশ্বর জ্ঞানযোগ এবং মানবপূজার মন্ত্রজপ- এতগুলির মহৎ প্রভাবও রামকৃষ্ণের জীবনে ব্যর্থ হলো। সূর্যের আলোতে ভাস্বর হয়ে উঠলেন না, সংস্কারের অন্ধকূপে তিনি আবদ্ধই রয়ে গেলেন! তখন চারিদিকে আলো প্রচুর আলো। ঐ নির্বোধ মানুষটির প্রতি অনুকম্পা জাগে। তাঁর আলোকলাভের ব্যাকুলতা সত্ত্বেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে এসেও তিনি সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন। তাঁর আত্মিক গঠনটি যদি আধ্যাত্মিক হত তা হলে তিনি ঐ সব মহোত্তম ভাবধারাতে পুষ্ট হয়ে যুগচেতনাকে আত্মসাৎ করে আন্তর আলোকে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে পারতেন।

তাঁর আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক ছিলো না বলেই, তাঁর জীবন অত, আকুলি বিকুলি সত্ত্বেও লাভ না করে, ক্ষুদ্র পল্বলে আবদ্ধ রয়ে গেল; আলোকের সাথে সমুদ্রের সাথে মিলিত হওয়ার মুখর সেই আলোক-কল্লোল এই নিরীহ মানুষটির পৌরাণিক অপধর্মের ক্লেদে রুদ্ধ কর্ণপটহ ভেদ করে কোনো সাড়াই জাগাতে পারলো না। সমুদ্রের মতো বিস্তার আবাহন- যুগের তাঁর প্রাণমূলে -

আপনার সঙ্গে রামকৃষ্ণ বিষয়ে সর্বাংশে একমত হতে পারছি না বলে দুঃখিত। আশা করি কিছু মনে করবেন না; আপনি রামকৃষ্ণের আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক বলায়

আমি যে এখানে সমালোচনা করলুম তা নয়, ‘আধ্যাত্মিক’ বলতে আমি যা বুঝি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা আলোচনা করলুম মাত্র।

আপনার বিরুদ্ধে আমার অনুযোগ করার অবশ্য সম্প্রতি একটু কারণ ঘটেছে। শ্রীমণি বাগচী প্রণীত ‘নিবেদিতা’ নামক একটি বই-এর ভূমিকার শেষে আপনার নামের স্বাক্ষর (1লা আশ্বিন, 1362) দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। স্তম্ভিত হওয়ার কারণ, ভূমিকাটি আগাগোড়া বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তজনোচিত প্রশস্তি যে বিবেকানন্দকে আপনি split personality এবং রেনেসাঁর (যদৃষ্টং) বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাতকারী বলে মনে করেন! বিবেকানন্দের বহু দুর্লভ গুণ ছিলো মানি। কিন্তু তাই বলে তিনি যা ছিলেন বা তিনি যা করেন নি, ভূমিকাটিতে আপনি তাই লিখেছেন। ভূমিকাটি শেষে আপনার স্পষ্ট স্বাক্ষর দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না। তাই সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করে আপনার কাছে নিবেদন সত্যই কি আপনি ঐ ভূমিকাটি লিখেছেন? না এর মূলে গ্রন্থকারের কোনো কারসাজি আছে? আমাদের দেশে সবই সম্ভব কি না! তাই দয়া করে পত্রোত্তরে সংশয় দূর করলে বাধিত হব। ইতি।

বিনীত

শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল

15ই আষাঢ়, 1365

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

এতোদিনে ওরি মধ্যে একটু ফুরসৎ পেয়েছি। তাই চটচট দুটি কথা আপনাকে লিখে নিই। আধ্যাত্মিক পুরুষ অর্থ যদি হয় realised পুরুষ, তাহলে সে অর্থে রামকৃষ্ণ পরমহংস আমার মতে আধ্যাত্মিক পুরুষ নন। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্যাটার্নের লোক বলতে যা বোঝায় সেটি তিনি ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। মনের গঠন আধ্যাত্মিক যাঁর তিনিই realised হবেনই হবেন এমন ধারণা আমার নয়। ব্যক্তির জীবনের কিংবা সামাজিক জীবনের process টি teleological নয়। আমি ভগবানের অস্তিত্ব মানি না। ভগবান সব process টিকে চালিয়ে চলেছেন এ ধারণা করবার কোনো যুক্তি আমি পাই নি। একটি বিশেষ কার্যকারণের ধারায় অন্য হেতু এসে তার মোড় ফিরিয়ে দেয়। এটা মানুষের অভিজ্ঞতা। তাই সত্য আপনা আপনি উপলব্ধির ঘাটে পৌঁছে দেয় এ আমি বিশ্বাস করি না। নানা কারণে, পারিপার্শ্বিকতার ঘাতপ্রতিঘাতে বানচাল হয়ে যেতে পারে সত্য-সাধনা। হয়েছেও বারে বারে সেটাও দেখা গেছে। একটি মানুষ সত্য-সাধনার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে সারাজীবন অথচ উপলব্ধি হলো না। তার কারণ হতে পারে অজ্ঞানতা, পারিপার্শ্বিকতা, সংস্কারবদ্ধতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সারাজীবন যে সেই ব্যক্তি সত্যকে বোঝবার ও পাবার চেষ্টায় প্রাণপাত করলো তার থেকে কি এটা প্রমাণ হয় না যে তার মানসিক ও চারিত্রিক গঠন হচ্ছে আধ্যাত্মিক? ঠিক যেমন একটি লোক সারাজীবন খেলাধুলা নিয়ে মেতে রইলো অথচ কোনো খেলাই ভালো করে

খেলতে পারলো না, বড় খেলোয়াড় হলো না বলে, তার মানসিক গঠন খেলোয়াড়ের বলতে তো বাধে না। কোনো লোক সারা জীবন গান সাধনা করেও ওস্তাদ না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার মানসিক গঠন যে গাইয়ের তাতে সন্দেহ থাকবার কোনো হেতু দেখি না। প্রাণপণ করে গানের সাধনা করলেই গাইয়ে হওয়া যায় না, তার জন্যে জ্ঞান চাই, বিচার চাই, বাছাই চাই, সহজাত চাই। আধ্যাত্মিক সাধনা ক্ষেত্রেও তেমনি শুধু আন্তরিকতা, ব্যাকুলতা থাকলে চলে না; জ্ঞান চাই, বিচার চাই, বাছাই চাই। এই সবের অভাবে রামকৃষ্ণ পরমহংস সারা জীবন ধরে আন্তরিকতার সঙ্গে পরম ব্যাকুলতার সঙ্গে চেষ্টা করেও উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে সব ছেড়ে ভগবৎ-উপলব্ধির জন্য পাগলের মতো হাতড়ে ফিরেছেন, এটা আমার কাছে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তাঁর মানসিক গঠন ছিল spiritual কিন্তু যেহেতু তিনি realised person নন তাই তাঁর মন spiritual realisation-এর শিখর ভূমিতে চিরবসতি লাভ করতে পারে নি।

মন নেমেছে, উঠেছে পারার মতো।

মণি বাগচীর লেখা 'নিবেদিতা' বইটির ভূমিকাটি পড়ে আমার উপরে রাগ করলে ঠিকই করা হবে। কিন্তু ঐ ভূমিকাটির একটু ইতিহাস আছে। মণি বাগচীর অনুরোধে আমি তাঁর বইটির ভূমিকা লিখতে সম্মত হই। আমি প্রায় কুড়ি পাতার একটি ভূমিকা লিখি। ভূমিকাটিতে আমি বাংলার রেনেসাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করি, আলোচনা করি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির চিন্তাধারা নিয়ে। তারপরে আমি দেখাই যে স্বামী বিবেকানন্দ, সেই বীর্যবর্তী চিন্তাধারার স্রোত রুদ্ধ করেন। পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে চাঙ্গা করে তোলেন। তিনি সেই দিক থেকে দেশের ক্ষতি করেছেন। কেন তিনি তা করেন তার কারণও আমি দর্শাই। আমার মতে স্বামীজীর মানসিক কাঠামো ছিল রাজনীতিজ্ঞের কাঠামো, ন্যাশানালিস্টের কাঠামো। মূলত তিনি ধার্মিক কাঠামোর লোক ছিলেন না। তাই প্রয়োজনের খাতিরে রাজনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরে এমন সব জিনিসের উপর ঝোঁক দিয়েছিলেন তিনি, যেগুলি বিচারশীল ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব ছিলো না। তিনি হয়ে দাঁড়ালেন split personality। তাঁর শিষ্যাও গুরুর কৃপায় হলেন split personality।

এই হলো অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য। মণি বাগচীকে আমি ভূমিকাটি পড়ে শোনাই। বলি তাঁকে যদি পছন্দ না হয় তো বলুন, এটা ছাপাবেন না তা হলে। কিন্তু আমি বদল করতে দেবো না, বাদ দিতেও দেবো না। তিনি বলেন তিনি আমার সঙ্গে একমত। বদলের কোন কারণ নেই। সবটাই ছাপা হবে। আমি তাঁকে পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে দিই। কপি না রেখেই দিই। কলকাতার বাইরে চলে যাই। ফিরে এসে দেখি 'নিবেদিতা' বইটি রয়েছে। খুলে দেখে হতভম্ব হই। আমার সেই ভূমিকা থেকে দেড় পাতা ছাপিয়ে সব বাদ দিয়েছে দেখলুম। এ ইতরতা যে কেউ করতে পারে তা কখনো কল্পনা করি নি। তারপরে মণি বাগচীকে চিঠির পর চিঠি লিখেছি, তিনি উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। যেটুকু বের করেছে সেটুকু পড়ে যাঁরা আমার মতামত

শুনেছেন তাঁরা আমাকে দু-মুখো ভাবলে তাঁদের দোষ দিতে পারি নে। এই হল এই ভূমিকার ইতিহাস। ভূমিকার কপিও রাখি নি যে সেটা ছাপাতে পারি। নির্বুদ্ধিতার দাম দিচ্ছি।

‘রামমোহন ইনস্টিটিউট্ অফ্ কালচার’ রেজিস্ট্রী করেছি। এবার তার তরফ থেকে কিছু বই ছাপাবার চেষ্টা করতে হবে ও বাংলার জেলায় জেলায় তার শাখা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মেদিনীপুরের জন্য বীরেন বাবুকে লিখেছি। আপনি কবে নাগাদ এ দিকে ফিরবেন?

আশা করি ভালো আছেন। ইতি।

ভবদীয়
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানবমন Published in “MANABMON” Vol 50, No. 1 January 2011

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; আলোচনা করেছি উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি জীবন; ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের দখলদারিত্বে গণহত্যাজাত কর্পোরেটের বিপুল লাভ প্রকল্পের মুখোশ খোলা, দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী সমীক্ষা, বহু রামায়ণ বিষয়ক সমীক্ষা আর চলতি পুথি হল উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা

১। টড়ের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫ । ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। *The Rāmāyaṇa Theme and Variation*
৩১। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
৩২। 'কথামৃত' আনকাট এবং...

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা